ঢেউয়ের পর ঢেউ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিশ্ববাণী
১১।এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

বিশ্ববাণী সংস্করণ
মহালয়া ১৩৬৬

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী
১১।এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
শ্রীগণেশপ্রসাদ সরাফ্
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
এট্‌সেট্‌রা

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রয়েল হাফটোন

ঢেউয়ের পর ঢেউ

Dheuer Par Dheu

by

Achinta Kumar Sengupta

।। এক ।।

অবশেষে অভিভাবকেরা ঠিক করলেন, মহীপতির বিয়ে দিতে হবে।

বিয়েই হচ্ছে অকাট্য মহৌষধ। শিবনেত্র শুধু প্রকৃতিস্থ হবে না, তাতে নেশার ঘোর লাগবে। আর মৃত্যুর পর পুনরারম্ভের রহস্যের চেয়ে মরদেহের রহস্য-সন্ধিৎসাই হবে প্রবলতরো। নির্জীব এক টুকরো পাথরের চেয়ে একটি জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ মানুষের দাবি হয়তো অনেক বেশি।

আর, সভ্যতার লক্ষণই হচ্ছে নির্বিবাদ স্বার্থপরতা। অতএব বিয়ে করলেই মহীপতি পুরোদস্তুর সভ্য বনে যাবে। দায়িত্ববোধের তীব্রতায় সে হয়ে উঠবে সঙ্কীর্ণ, সরল—এক কথায়, স্বাভাবিক হওয়াটাই জীবনের প্রকাণ্ড কৃত্রিমতা। সেই অর্থে বিয়ে-ব্যাপারটা জীবনের একটা কৃত্রিম অঙ্গরাগ। এই সব ও এর অনুসারী আনুষঙ্গিক যুক্তিতে ভর করে অভিভাবকরা মহীপতির জন্যে পাত্রী ঠিক করে এলেন।

ছেলেবেলা থেকেই মহীপতি বাউণ্ডুলে, সন্নেসি-ঘেঁষা। যে-বয়সে ছেলেরা স্কাউট হয়ে দৌড়-ঝাঁপ করে, সেই বয়স থেকেই ও বেদান্ত মিশনের চাঁই। বিকেলবেলা সবাই গেছে দল বেঁধে গোল্লা-ছুট খেলতে, ও একা চলে এসেছে শ্মশানঘাটে, সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে নদীর জলে পা ডুবিয়ে পশ্চিম-আকাশে সূর্য্যের চিতারোহণ দেখছে। ছেলেবেলা থেকেই ওর মুখে একটি বৈরাগ্যের লাবণ্য, ব্যবহারে নীরব নির্লিপ্তি। কোথায় কোন সন্নেসি এলো, মহীপতি চললো তার ডেরায়। তাকে মন্ত্র দাও, আসন শেখাও, অমনি নিরাবলম্ব, নিঘৃণ করে তোলো। দুই চোখে মহীপতির যেন কোন দুর্গম, দুরধিগম্য জগতের প্রতি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা।

স্বভাবে অত্যন্ত চাপা, সকলের থেকে আলাদা, কোনোকিছুতে মহীপতির কণামাত্র স্পৃহা নেই। মাছ-মাংস তো খায়ই না, শরীর-রক্ষার জন্য শস্যেরো প্রাণহানি করা সঙ্গত হবে কি না সে-সম্বন্ধেও তার মনে প্রশ্ন উঠেছে। একমাত্র বায়ুভুক হ'য়ে বাঁচবার সাধনায় সে এখনো অনেক দূর পিছিয়ে আছে—তবে শরীর যদি না-ই অটুট থাকলো, তাকে আত্মায় অতিক্রম করবার কোনোই মানে হয় না বলে তবু দু'বেলা দু'টি সে ভাত খায়। লোকে নইলে নেহাৎ পাগল বলবে বলে গায়ে সে কোনো রকমে একটা কাপড় রাখে। এক কথায় সহপাঠীদের কাছে সে সচ্চরিত্রতার মূর্তিমান উদাহরণ—বিলাস-বর্জনের উৎকট প্রতিজ্ঞা। গলায় মোটা একগাছি সাদা পৈতে, পায়ে খড়ম, গায়ে এক টুকরো এলো উত্তরী -মহীপতি যেন নির্ধূম বহ্নিরেখা। চুলের নিভাঁজ কদম-ফুলি ছাঁট, বেশের স্বল্পতা ও ব্যবহারের কঠোর আবেগহীনতা তাকে সকলের চোখে সবিশেষ করে তুলেছিলো। মরে গেলেও সে মিথ্যা বলবে না, যখন যা করবে বলবে তখন তা সে করবেই। এই সব উদ্ধত দুষ্কর্মণ্যতার জন্যে সবাই তাকে সমিহ করে' চলতো। তার চরিত্রের দীপ্তি যেন বহিরঙ্গের উপরেও বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু উৎপাত জুটলো তার অতিধর্মপ্রবণতার দুঃসহ প্রাবল্যে। ওটাকে চারিত্রিক দীপ্তি বলে কেউ আর বিশেষ মানতে চাইলো না, ভাবলে একটা ব্যাধি। তার নিরাকরণের উপায় বার করতে সবাই হাঁপিয়ে উঠলো। আজকাল সে কালেজি লেখা-পড়া ছেড়ে কীর্তনের দলে ভিড়েছে, খোলে চাঁটি মেরে গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজবার বেলায়ই সে দশায় পড়ে। নিজের একলা থাকবার ঘরের দেয়াল-মেঝে সে ছবিতে মূর্তিতে প্রায় একটা পটুয়ার দোকান করে তুলেছে, পূজার কোনো উপসর্গ-উপকরণই সেখানে বাদ পড়ে নি। জ্বালায় ধুনো, পড়ে স্তোত্র, ঝিনুকের উপর ফোঁটা ফেলে রঙচঙে মোমবাতি বসিয়ে দেব-দেবীর আরতি করতে পর্যন্ত ছাড়ে না। ঘরে একবার ঢুকলে তাকে বার

করে আনা পরিবারের পক্ষে ভীষণ এক সমস্যা হয়ে ওঠে। কোনো সময়ে ফাঁক পেয়ে একলা একটু থাকলেই সে মূর্তির সামনে ব্যায়ামে বসে গেছে। তুমি কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে পারো, কিন্তু যে-লোক জেগে চোখ বুজে বসে থাকে, তাকে সাধ্যি কি তুমি টলাও! কখনই বা স্নান করতে যায়, কে-ই বা তার জন্যে ভাত বেড়ে বসে থাকে। পরিবারের কারুর সুখ-সুবিধের দিকে তাকাতে তার বয়ে গেছে। বরং তার দিকেই সবাই তাকাক। সবাইকে সে যেন বিবাগী করে ছাড়বে।

বেশি কিছু বলবারো জো নেই। বললেই বা কে শোনে? শত ঘায়েও তার মেরুদণ্ড বেঁকবার নয়, স্নায়ুতে-শিরায় তার প্রতিজ্ঞার প্রাখর্য। না পোষায়, মহীপতি সটান বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। এই কীর্তিটা তার নতুন নয়—দু-দুবার সে এক-কাপড়ে, খালি-পায়ে, খোলা-মাথায় বেরিয়ে পড়েছিলো, কোথায় কোন দিকে কেউ বলতে পারে না—কত কান্না-কাটি, কত খোঁজা-খুঁজি করে তবে তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো। এক পা তার সংসারের চৌকাঠে, আর এক পা তার বাইরের পৃথিবীর দিকে—তার সমস্ত বন্ধন-বেদনার ঊর্ধ্বে আকাশের অবারিত শূন্যতা! মহীপতির জীবনে এই এক দিকে নির্লিপ্ত ও অন্য দিকে বিদ্রোহী ভঙ্গিটা সকলের গা-সওয়া। বেশি কিছু বলতে গেলে আবার সে পিঠ দেখাবে, ফেরবার তার কী আকর্ষণ!

অতএব এই একটি আকর্ষণের বস্তুর সন্ধান করতে হবে—যাতে একবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও ধর্মেরই টানে আবার তাকে নিজে থেকে সুড়সুড় করে ফিরে আসতে হয়। আত্মার চেয়ে সংসারের চোখে, সমাজের চোখে, দেহ যে কত বড়ো ও কত দামি, এই সোজা কথাটাই মহীপতিকে এখন চোখে আঙুল দিয়ে শেখানো দরকার। তার সঙ্গে আর কেউ এঁটে উঠছে না।

তা ছাড়া, সম্প্রতি আরেক উৎপাত জুটেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মহীপতির ব্যবহারে গাম্ভীর্য না-এসে এসে যাচ্ছে এক উগ্র

অসহিষ্ণুতা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-চেতনাই হচ্ছে সংসারের সংজ্ঞায় বড়ো সভ্যতা, এবং পরের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করবার ঔদ্ধত্যই হচ্ছে বর্বরতার নামান্তর। এতোদিন কেবল নিজের সংস্কার করেছে, হঠাৎ সে প্রচারক হয়ে অবতীর্ণ হলো। আর সে প্রচার শুধু কথায় নয়, তার পরাক্রান্ত শরীর দিয়ে। চলন্ত বাস্-এর গায়ে পরমহংস নাম দেখে নিজে সে ভক্তিতে রাস্তার ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে বাস্‌কে প্রণাম করুক, ক্ষতি নেই। বেশভূষায় নিজে সে প্রকৃতির প্রতিবেশী হোক, কেউ তাকে কিছু বলতে আসছে না; কিন্তু ক্রমে-ক্রমে সে পরিবারের ও পাড়ার ছেলে-ছোকবাদের চরিত্র-সংশোধনে মন দিলে। চুলের দীর্ঘতা কতদূর পর্যন্ত সচ্চরিত্রতার নির্দ্দেশক, কোথায় একচুল অতিক্রম করলেই তা ব্যভিচাবের কোঠায় গিয়ে পড়বে— এ সম্বন্ধে সে আজকাল চুল-চেরা নির্ভুল মত প্রকাশ কবছে। পাড়ার লাই-ব্রেরিটায় উপন্যাস-নাটকের সংখ্যাধিক্য থেকেই দেশের দুর্নীতি ও অধোগতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, অতএব সেই সব জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলে তাদের জায়গায় জাতিগঠনের বই সাজাতে হবে সে যতই ভুল বাঙলায় লেখা হোক না কেন। ঐশ্বরিক ভাবোদ্দীপনা ছিলো না বলে ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়ান লাইব্রেবিও একদিন পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো। লাইব্রেরিতে কী রাখতে হবে বা না হবে সেই বিষয়ে মহীপতি প্লেটোর চেয়েও নির্মম। তাসের আড্ডা ভেঙে মহীপতি প্রকাণ্ড এক কুস্তির আখড়া বসালো। আর নারী মাত্রেই যে পূজার্হা, মাতৃরূপা, এই বিধান দিতে গিয়ে সে ছেলেমেয়েদের বয়সের কথাটাও বিবেচনা করে দেখলো না। সবাই মনে করতে লাগলো এ-সব মহীর ভয়ানক বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

এত করেও কাউকেই যখন সে মানুষ করতে পারলো না, তখন তাকেই মানুষ করা যায় কি না দেখবার জন্যে তার ঘরে ললিতার পড়লো ডাক। প্রথমটা মহীপতি ঘোরতর আপত্তি করলে, কিন্তু যার রক্তে তার এত তেজ, সেই পিতৃদেবই বা সহজে হাল ছাড়বেন

কেন? জগদীশবাবু ঘোর বিষয়ী লোক, যাকে বলে তুঁদে জমিদার। দাঙ্গা দমাতে তাঁর নিজেরই হাতে জমকালো লাঠি ঘোরে। বয়েসে ভাটা পড়লেও শরীরে তাঁর এখনো একটু রেখা পড়ে নি, চোখে বিদ্যুৎ, গলায় যেন এখনো বাজ গরজাচ্ছে। তাঁর শাসনে সমস্ত বিদ্রোহী প্রজামহল মুষড়ে পড়েছে। এ তো তাঁর নিজের অপত্য। তিনি হাঁক দিয়ে বললেনঃ কামিনীর প্রতি এত যে তোমার অবজ্ঞা, তোমার কোন দেবতাটা তাকে সম্মান করে নি শুনি? সংসারধর্ম করে বংশরক্ষা তো করেইছে, স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলে পরে মৃতদেহ কাঁধে করে সপ্তভুবন তোলপাড় করে ছেড়েছে। অত যে কালীপূজো করো, তার পেছনে মহাদেবের প্রকাণ্ড প্রেম দেখতে পাও? আর যার নামের অত কীর্তন করো শুনতে পাই, তার কীর্তিই বা ভুললে চল্‌বে কেন? বুঝলে, দেবতারা দেবতাই —তোমার মতন মানুষগুলোই নিতান্ত উজবুক।

মহীপতি ম্লান গলায় বললে,—কিন্তু বিয়ে করতে আমি এখনো প্রস্তুত হইনি।

জগদীশবাবু ফুঁয়ানো আগুনের মতো জ্বলে উঠলেনঃ এ যে তোমার কালেজি ছোকরাদের নতুন আমদানি-করা ফ্যাশানের মতো কথা হচ্ছে! তুমি অপ্রস্তুতটা কোথায় শুনি? ধর্ম করছ, গৌরব করতে পারি, উপযুক্ত শ্রদ্ধা করতে পারি—তোমার আটকাচ্ছে কোথায়? এই স্ত্রীর জন্যে রামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ করে নি? সত্যবান বেঁচে ওঠে নি? বশিষ্ঠ তপঃসিদ্ধ হয় নি? এই স্ত্রীর মধ্য দিয়েই কি নারীর সতীত্বের পরিপূর্ণতম বিকাশ হয় না? তুমি তাকে অস্বীকার করবে?

মহীপতি আরো মিইয়ে গেলো। বললে,—কিন্তু স্ত্রী আমার সাধনার বিঘ্ন হবে।

—হাতি হ'বে! জগদীশবাবু বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তোমার কোন ঋষি-মুনিটা নিষ্পত্নীক ছিলেন শুনি? তোমার মনু কোথায় এর উল্টো বিধান দিয়ে গেছেন দেখাতে পারো? সাধনা!

স্ত্রী-ছাড়া সংসারের কোন সাধনাটা পূর্ণ হয় জিগ্‌গেস করি? প্রকৃতি আর পুরুষ না হলে বিধাতার এতো বড় একটা সৃষ্টি-সাধনাই নষ্ট হ'য়ে যেত—তার খেয়াল রাখো?

মহীপতির গলা আরো নরম হয়ে এলো: কিন্তু আমি সন্নেসি।

—তাই কাছা নামিয়ে তোমাকে এখন বনে গিয়ে ঘাস চিবোতে হবে? জগদীশবাবু মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন: তা হলে বনের একটা পশুও তো তোমার চেয়ে বড়ো সন্নেসি, সে তোমার মতো লেখাপড়া না শিখে জন্ম থেকেই বনে আছে। সন্নেসি! সন্নেসি বলতে চাও তো জনক রাজা। বিপুল বসুন্ধরাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করেও যে ব্রহ্মলীন। তোমাকে ভগবান এই দেহ-মন, এই ঘর-বাড়ি, এই আত্মীয়-বন্ধু দিয়েছে কি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে? তবে নরদেহ ধারণ না করে সোজাসুজি একেবারে বনে গিয়ে বসবাস করলেই পারতে। সন্নেসি? সন্নেসি না আস্ত, গোল একটি গাধা!

অগত্যা মহীপতি চুপ করে গেলো। প্রকাশ্যে এমন সে গম্ভীর হয়ে গেলো যে, হঠাৎ কী একটা কঠিন কাজ সে করে বসে তারই ভয়ে কারুর মনে কোনো স্বস্তি রইলো না।

কিন্তু আশ্চর্য, ললিতাকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো কঠিন কাজই সে করলে না যা-হোক।

ললিতার বাবা ধরণীবাবুর অবস্থা কিছু ভালো নয়, হাইকোর্টের পেপার-বুক বিভাগে সামান্য কেরানির কাজ করেন। কলকাতায় একখানা পৈত্রিক বাড়ি আছে, তা ভাড়া খাটে। তার থেকে টাকা বাঁচিয়ে মাইনেটাকে একটু যা-হোক তিনি ভদ্র চেহারা দিয়েছেন। ললিতা তাঁর এই এক মেয়ে, ছোট ভাইটিকে নিয়ে মাতৃহীন, সবে এই ষোলোয় পা দিয়েছে। তখনো সমাজের হাওয়াটা এত জোরে উলটো দিকে বইতে সুরু করে নি, উপন্যাসের নায়িকাদের বয়েস তখন বড়ো জোর তেরো। পায়ে মল বাঁধবার রেওয়াজ তখন সবে কমে এসেছে এবং মেয়েরা ইস্কুলে গেলেও পাশ করবার ও নিজের পায়ে

দাঁড়াবার দুরন্ত মত্ততা তখনো পেয়ে বসে নি। ললিতার বয়েস আন্দাজে স্বাস্থ্যবৃদ্ধিটা আশানুরূপ স্থগিত থাকে নি; তা ছাড়া ধরণীবাবু সেকেলে লোক, পয়সাও কিছু তাঁর বেশি নয়—তাই সুপাত্র একটি হাতে এসে পড়তেই তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না।

সুপাত্র নয় তো কী! চলতি অর্থে লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ না হ'লে কী এসে যায়—মেয়ে তো তার সঙ্গে বসে ক্রস্‌-ওয়ার্ড-পাজ্‌ল্‌ খেলবে না। সঙ্গতি-সম্পন্ন পরিবার, জোয়ান বয়েস, বলীয়ান স্বাস্থ্য—তা ছাড়া সব চেয়ে মহীপতির বড়ো পরিচয় হচ্ছে তার গভীর ধর্মপ্রাণতা। খাঁটি, মজবুত মানুষ। এই তার চরিত্রবত্তার তীব্র জোতিতে ধরণীবাবুর দুই চক্ষু ধাঁধিয়ে গেলো। দিব্যি খেয়ে-পরে থাকতে পাবে, শরীরে কোথাও এতোটুকু রোগের মালিন্য নেই, দৃপ্ত উচ্ছ্বসিত স্বাস্থ্য—তা ছাড়া এমন ন্যায়ানুগত, ঈশ্বরভীরু, ধর্মপরায়ণ ছেলে—ললিতার জন্যে এর চেয়ে যোগ্যতরো বর কী আর নির্ব্বাচন করা যেতো? আধুনিক সভ্যতার ঘূর্ণিপাকে পড়ে চারদিকের মহান আদর্শ যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছে, তখন এমনি স্থিরলক্ষ্য ও সত্যসন্ধ জামাইয়ের সন্ধান পাওয়া অলৌকিক সৌভাগ্যসূচনা বলেই মানতে হবে। তা ছাড়া এ-বিয়েতে তাঁরা পণ নিচ্ছেন না। সেটা কম কথা নয়। ললিতা মিছিমিছি এতোদিন শিবপূজো করে নি।

আর কিছু দেখবার দরকার ছিলো না। দেখবার কী-ই বা আর দরকার থাকতে পারে? কপালে কী আছে দেখতে গিয়ে কপালের তিলকটাই সবার আগে চোখে পড়লো। মলাটটা জাঁকালো হ'লেই যথেষ্ট—তারপর তাতে আবার সোনার অক্ষরে মহীপতির ধর্মানুরাগের কথাটা সাড়ম্বরে শোভা পাচ্ছে!

বিয়ে যেখানে আগাগোড়া একটা ধর্মানুষ্ঠান, পূর্ব্বাপরলৌকিক একটা অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্বন্ধ, সেখানে এর চেয়ে বেশি কিছু আর চোখে পড়ে না। তাই ললিতাও দুই চোখের উপর ছোট একটি ঘোমটা টেনে আধো-লজ্জায় আধো-ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মহীপতির পশ্চাদ্বর্ত্তী হলো।

॥ দুই ॥

জলবায়ুর দৌরাত্ম্যে ললিতাকে একটু বড়ো দেখালেও আসলে তার মন একান্তই কচি, ঘাসের ডগাটির মতো সবুজ। যেমন হাসি-খুশি, তেমনি মিশুক। সমস্ত গায়ে লক্ষ্মীর ছিরি-ছাঁদ, পায়ের পাতা পড়ে না তো ক্ষীরোদসাগরে ঢেউ জাগে। তাকে পেয়ে শ্বশুর-বাড়ির চারদিক থেকে অঢেল আদর উথলে উঠেছে। জা-রা তাকে সাজায়, ননদরা তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করে। শাশুড়ি বারে-বারে এসে মুখে খাবার ভেঙে দেন। জগদীশবাবু তো তাকে চোখে হারান, যেই দেখে সেই তাকে অনর্গল প্রশংসা করে যায়—রূপে-গুণে এমন বউ কবে কার চোখে পড়েছে!

কিন্তু মহীপতি অবিচল। বিয়ে সে একটা করেছে মাত্র। তার দৃঢ়, ঋজু মেরুদণ্ডে এতটুকু শৈথিল্য নেই।

বাবার কাছে বাইরে সে বশ্যতা স্বীকার করেছে, কিন্তু তাই বলে সে তার প্রতিজ্ঞাকে অবনমিত করবে না। তিনি ভেবেছেন, বিয়ে করলেই মহীপতি চূড়ান্ত তামসিক হয়ে উঠবে। জীবনের পরমার্থ বুঝি এই হীন আত্মাদরে। কিন্তু মহীপতি এই চরাচর, এই স্থাবর-জঙ্গমের ঊর্ধ্বে—এই আবিল পৃথিবীর দূর পরপৃষ্ঠায় একটি বিরাট ও মহান আকাশ-অবকাশের খবর পেয়েছে। স্থূল ও গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের কারাগারেই সমস্ত সৃষ্টি বন্দী নয়, তারো অতীত কোনো চেতনা গভীর নিঃশব্দ ঝঙ্কারে মহীপতিকে মুহুর্মুহু নাড়া দিতে থাকে। সে-চেতনা শুধু প্রাণধারাবাহী এই মর্ত দেহের চেতনা নয়—মৃত্যুকে যে জয় করেছে, দেহকে অতিক্রম করেছে, সেই অমৃতের চেতনা।

মহীপতি তার প্রতিজ্ঞাকে কঠোরতরো করে তুললো। তাকে সবাই যেন এত ভঙ্গুর, এত দুর্বল মনে না করে।

সমস্ত সংসারে এই উদ্বেল আদর, অজস্র করুণা, কিন্তু একজায়গায়, সারা পথ প্রবাহিত হয়ে ঝর্ণা যেন মরুপ্রান্তরে এসে শুকিয়ে মরে। দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে ললিতার অসম্পূর্ণ একটি দৃষ্টি-বিনিময় পর্যন্ত হয় না, কিন্তু রাত্রির প্রশ্রয়েও এই কঠিন ঔদাসীন্য। স্বামীর এই উপেক্ষাময় ব্যবহারটা ললিতার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়।

চারদিকে ফাঁকা মাঠ, বাঁশের বনে হাওয়া সাঁ-সাঁ করছে, খোলা জানলার ওপারে জমাট অন্ধকার—একলা বিছানার এক পাশে শুয়ে ললিতার ভয় করতে থাকে। ঘরে মাটির একটা বাতি জ্বলে, তার বিবর্ণ, ক্ষীণ শিখার মতো জ্বলে তার প্রতীক্ষা। তারপর মহীপতি যখন ঘরে ফেরে, তখন তার জীবনে স্বামীর প্রথম অস্পষ্ট সস্নেহ স্পর্শটির জন্যে হয়তো মনে-মনে প্রার্থনার সুর বেজে ওঠে। কিন্তু মহাপতির কোথাও এক কণা চাঞ্চল্য নেই, ঘরে যে আর কারুর উপস্থিতি প্রখর হয়ে আছে সেদিকে সে অন্ধ। আলোয় সে তার গীতা খুলে বসে। নির্লিপ্ত, নিবিষ্ট মুখভাব। জীবনে কোথাও যে তার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে তাতে তার এতটুকু আভাস নেই, চিরাচরিত অভ্যাসে কোথাও এতটুকু ছন্দোহানি হবে না।

তারপর এক সময়ে ললিতা ঘুমে কাদা হয়ে নিঝুম হয়ে যায়। মহীপতি দরজা খুলে বাইরের নিঃশব্দস্পন্দিত, নীরন্ধ্র অন্ধকারে চলে আসে। সেখানে রাত্রির সেই সমাহিত, নিশ্চল তপস্যার একজন অপক্ষপাত দর্শক হয়ে বসে থাকতে তার ভারি ভালো লাগে। সেখানে তার জন্যে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি, বিস্তৃত আশ্রয়, নিগূঢ় সত্য নিহিত রয়েছে। তারি সন্ধানে ও উদ্ধারে কত রাত্রে মহীপতির চোখে ঘুম আসে না।

একদিন মুখ গম্ভীরতরো করে মহীপতি ললিতাকে বললে,—স্ত্রী অর্থ কী, জানো?

মহীপতির এই প্রথম সম্ভাষণ। তরল স্পর্শে নয়, গদ্‌গদ আদরে

নয়, নিবিড়াভ দৃষ্টিতে নয়। নিতান্তই ইস্কুল-পণ্ডিতের মতো কাঠখোট্টা মুখ করে কঠিন প্রশ্ন করে বসা।

প্রথমটা ললিতা ভয়ে একেবারে ভেবড়ে গেলো। মুখে তার কোনো কথা এলো না। কিন্তু মহীপতি তার ভঙ্গিটা এমন কঠোর করে রেখেছে যে উত্তর একটা তাকে পেতেই হবে।

—স্ত্রী বলতে তুমি কী বোঝ?

ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে ললিতা বল্‌লে,—কী জানি!

—কোনো অর্থই তোমার জানা নেই? মহীপতি ফের জিগগেস করলে।

কথাটার প্রতিশব্দের জন্যে ললিতা মনে-মনে অভিধান ঘাঁটতে সুরু করলো। মুখ থেকে টুপ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো: পত্নী।

—তা তো হলো। মহীপতি তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতরো করলে: আর কিছু?

কথার উত্তাপে ললিতার মুখে সামান্য দীপ্তি দেখা দিলো। বললে,—আবার কী! ভার্যা।

—সে তো স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে হয় বলে। আর কোনো ভালো অর্থ বলতে পারো না?

ললিতা হাঁপিয়ে উঠলো। বল্‌লে,—আর কী থাকতে পারে? হ্যাঁ, লজ্জায় একটু হেসে ললিতা কুণ্ঠিত গলায় বলল,—অর্ধাঙ্গিনী।

মহীপতির মুখ-চোখ বিরক্তির রেখায় কুটিল হয়ে এলো। গলায় ঝাঁজ এনে বললে,—নভেলি অর্থ খুব শিখেছ দেখছি। এর চেয়ে আর কোনো ভালো কথা জানা নেই? খুব বিদ্যানী হয়ে উঠেছ যে।

ললিতার মুখের দীপ্তি এক ফুঁয়ে গেলো নিবে।

—স্ত্রী মানে হচ্ছে সহধর্মিণী। মহীপতি জোর গলায় বললে,— আমার যা ধর্ম, তোমারো তাই। অর্থাৎ আমি যা করবো, তোমারো তা করতে হবে। বুঝলে?

ভয়ে-ভয়ে ম্লান মুখে ললিতা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

—সব বিষয়ে স্বামীর অনুগমন করাই হচ্ছে স্ত্রীর ধর্ম। রাম যখন বনবাসে গেলেন, তখন সীতা রাজপুরীর সমৃদ্ধির মাঝে বসে থাকতে পারলে না। জানো তো সে-কথা?

লক্ষ্মণের বেলায় ঊর্মিলার কী হয়েছিলো সে-কথা ললিতার ঘুণাক্ষরেও মনে এলো না। চোখ নামিয়ে অপরাধীর মত সে বললে,—জানি।

—তেমনি, মহীপতি বলতে লাগলো: প্রতিপদ তোমাকে আমার অনুসরণ করতে হবে। বিয়ে আমাদের সমাজের জন্যে নয়, ধর্মের জন্যে। আমাদের জীবনে তার ব্যাখ্যাকে আরো বিস্তারিত করতে হবে কী বলো?

এক বর্ণও তার না বুঝে ভীরু, অস্ফুট গলায় ললিতা বললে,—হ্যাঁ।

অতএব মহীপতি প্রস্তাব করলে, ললিতাকেও মাছ-মাংস ছাড়তে হবে। গভীর রাত্রে শোবার আগে ও অতি-প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে মহীপতির সঙ্গে স্তোত্র পড়তে হবে। অর্থগ্রহণ ও মুখস্ত করতে হবে সেই সব স্তোত্র। মেয়েরা সাধারণতো এই বয়সে পোশাকে-গয়নায়, তরল লঘুচিত্ততায় যে সব তুচ্ছ, পার্থিব বিলাসিতা করে, তাতে লোভ না দেখিয়ে তাকে হতে হবে নিতান্ত শুদ্ধসত্ত্ব, অকামময়ী ব্রহ্মচারিণী। তার গুরুর মত হলে শিগগির তাকে মন্ত্রও নিতে হতে পারে। সস্ত্রীক ধর্মসাধনাই সিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশস্ত—সেই অর্থেই মহীপতির সহধর্মিণীর প্রয়োজন হয়েছে। অন্তত গুরুর তাই বিধান। কেমন, রাজি?

ভয়ে-ভয়ে ললিতা আবার ঘাড় হেলালো।

—আমাদের বিয়ে হবে আদর্শ বিয়ে, আমরা একে একটা সাধারণ সামাজিক ঘটনা মনে করবো না, একে আমার খুব বড়ো একটা অর্থ দেব। এর মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মার গভীর উপলব্ধি হবে।

স্বামীর এই মিষ্টি কথাগুলি যেন ঘুমের স্পর্শের মত ললিতার চোখে কোমল লাগে।

কিন্তু প্রতিবাদ এলো অন্য তরফ থেকে। মহীপতির মা ললিতাকে মাছের বাটিটা এক পাশে সরিয়ে রাখতে দেখে ব্যাপারটা জেনে ফেললেন। সধবা বউ, মাছ খাবে না—এমন একটা জলজ্যান্ত কদাচার তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকলো।

—রেখে দাও, যেমন সব বিদঘুটে কথা। ও-পাগলের কথা তুমি কানে তুলো না, বউ-মা। বলে তিনি নিজে হাতে পেটির মাছখানা তুলে ললিতাকে খাওয়াতে গেলেন।

ললিতা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে,—থাক মা, না-ই বা খেলাম।

—না-ই বা খেলাম কী! সধবা বউ মাছ খায় না, ভূ-ভারতে এমন কথা কেউ শুনেছে নাকি কখনো?

—মাছ আমি ভালোবাসি না।

—তুমি ভালোবাসো না, মাছ তোমাকে ভালোবাসবে। নাও, হাঁ করো শিগগির।

ললিতা ফের কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—উনি যখন চান না, তখন না খেলে কী এমন এসে যাবে, মা? এই খেয়েই তো আমার পেট ভরে গেছে।

স্বামীর প্রতি প্রকাশ্যে কোনো মমতা বা অনুরাগ দেখাতে ললিতার নিদারুণ লজ্জা করে। শুধু তার প্রকাশেই লজ্জা নয়, প্রতিফলেও লজ্জা।

শাশুড়ি প্রায় তর্জন ক'রে উঠলেন: ওই তোমার একমাত্র গুরুজন—আমরা তোমার গুরুর গুরু নই? তুমি কেবল ওকেই চিনবে, আমাদের মানবে না? মাছ তুমি খেয়ে ফ্যালো বলছি।

অগত্যা মাছ ললিতাকে খেতে হলো।

এই কথাটা আনাচে-কানাচে কোথাও আর চাপা রইলো না। এই নিয়ে মহীপতির প্রতি শাণিত বিদ্রূপের ছদ্মবেশে অভিভাবকদের দুঃসহ শাসন চললো।

সেই থেকে মহীপতি একেবারে নিঃশব্দ, চোখে-মুখে ভরাট গাম্ভীর্য, ঘোলাটে মেঘলা ভাব।

স্বামী সেই একদিন একটু অলক্ষিতে কাছে এসেছিলেন—ব্যবধান আবার বিস্তৃত হয়ে পড়লো। তার অপরাধের অপরিচ্ছন্ন গ্লানি নিয়ে ললিতা মহীপতির মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাতে পারে না। স্বামী ভোর রাত্রে কখন যে জাগে ললিতা তার টেরও পায় না। স্নান করে বীজমন্ত্র আওড়াতে-আওড়াতে সে বেরিয়ে পড়ে। চেয়ে-চিন্তে ফুল আর বেল-পাতা কুড়িয়ে আনে। তারপর সেই যে পূজোর ঘরে গিয়ে ঢোকে, বেরুবার কথা আর মনেই থাকে না।

শাশুড়ি বলেন: ওর জন্যে তুমি আর কতোক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে, বউ-মা? ছেলেমানুষ, মুখখানা শুকিয়ে একেবারে এতোটুকু হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে নাও। ওর যতোক্ষণ খুশি কোশাকুশি নেড়ে তপ-জপ করুক। এতো বয়েস হলো, এখনো ওর পুতুল খেলা ঘুচলো না।

এ-কথায় ললিতা বিশেষ গা করে না, লাজুক গলায় বলে,—না, আমার তেমন খিদে পায় নি। আমি আরো খানিকক্ষণ থাকতে পারবো।

—খিদে পায় নি মানে? বেলা কতো হলো তোমার খেয়াল আছে? শাশুড়ি তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলেন: নাও, ওঠো, পিত্তি পড়ে অসুখ করবে যে।

তবু ললিতার খেতে ইচ্ছে করে না। অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে বলে: না মা, অসুখ করবে না। আমি আরো একটু বসি।

—তোমাদের দুজনের জন্যে চাকর-ঠাকুর হাঁ করে ঠায় বসে থাক আর-কী! শাশুড়ি মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠেন: একজনের দেখাদেখি তুমিও আবার ফ্যাশান করতে গেলেই হয়েছে! আমাকেও সঙ্গে-সঙ্গে পাগল করে ছাড়বে দেখছি।

এক রকম জোর করেই ললিতাকে ভাতের থালা নিয়ে বসতে

হয়। একজন এত বেলায়ও উপোস করে আছে ভাবতে গলা দিয়ে তার ভাতের গরস নামতে চায় না। কিন্তু তার আর উপায় কী বলো।

তা ছাড়া আজকাল মহীপতির আবার এক নতুন উপসর্গ দেখা দিলো। এত কাল আমিষ স্পর্শ করতো না, এবার ঠিক করলে আমিষের আঁকশালেও সে খাবে না। অতএব পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের হাতেই তাকে ডালে-চালে ফুটিয়ে নিতে হয়। খেতে-খেতে সেই সন্ধে। সন্ধেয় সেই দু'টি খেয়ে রাত্রে আর তার খিদে থাকে না, শুধু দু টুকরো ফল চিবিয়েই সে খাওয়ার পাট সমাধা করে।

নেপথ্যে দাড়িয়ে ললিতা দুচার দিন এই কাণ্ডটা দেখলে—তার স্বামীর প্রতি সংসারের এই অশোভন উপেক্ষা। তাকে তিনি উপেক্ষা করেন, তবু এটা তার সহ্য হয়। কিন্তু স্বামী যে কোনোরকমে উপেক্ষিত হবেন, এটাই মনে হয় মর্মান্তিক। নিজেকে আর সে আড়ালে অবগুণ্ঠিত রাখতে পারলো না, উদাসীন সংসারের উপর কর্তৃত্ব দেখালো। কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিজেই গেলো সে উনুন ধরাতে।

স্নান করে মহীপতি বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার জন্যে রান্না তৈরি। দেখে তো অবাক!

বললে,—তুমি আবার কষ্ট ক'রে রাঁধতে এলে কেন? এ কী উৎপাত!

খুশিতে দু' চোখ উজ্জ্বল করে ললিতা বললে,—কষ্ট কী! আমি জায়গা করে দিচ্ছি, তুমি খেতে বোসো।

—পাগল! মহীপতি গম্ভীর মুখে বললে,—তোমার হাতের ছোঁয়া আমি খেতে যাবো?

ললিতার মাথার উপর যেন টুকরো-টুকরো হয়ে আকাশ ভেঙে পড়লো। শ্রমমলিন তপ্ত মুখে বিবর্ণ ব্যর্থতা।

সে-রান্না তো মহীপতি ছুঁলোই না, এমন-কি উনুনটা পর্যন্ত নতুন করে পাততে হবে। প্রাণিহত্যার পাতক যাকে লেগেছে, তার শারীরিক স্পর্শে সমস্ত রান্নাই হয়েছে অপবিত্র। মহীপতি আজ উপোস করবে।

কারণটা সাড়ম্বরে ব্যাখ্যা করতেই ললিতা তার দু পায়ে আর যেন কোনো বশ পেলো না। মাটির উপর বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো। তার এতক্ষণের সযত্নরচিত উপচার

—তোমার কান্নার কী হ'লো? মহীপতি নিষ্প্রাণ গলায় বললে, তোমাকে তো আমি কিছু কঠিন কথা বলি নি। একদিন না খেলে হয় কী!

কিন্তু কান্না ছাড়া ললিতার কোনো উত্তর নেই। আর, কান্নায় মহীপতি একেবারে কাদা হয়ে যাবে, তেমন সে সস্তা বা সৌখিন নয়।

ব্যাপারটা প্রায় একটা খণ্ডদৃশ্য হবার জোগাড়। এদিকে সংসার এক্ষুনি রূঢ় দৃষ্টিক্ষেপ করে বসবে। অতএব আর বাক্যব্যয় না করে মহীপতি আস্তে-আস্তে সরে পড়লো।

এখন গেলো সে তাদের হরিনামবিতরণী-সভায়। রাত দশটা পর্যন্ত খোল-করতাল পিটিয়ে সেখানে পুরোদমে কীর্তন চলবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা। ততক্ষণ ললিতা সাদা চোখে বসে থাকতে পারে না, ঢুল আসে। তবু সে প্রাণপণে চোখ দুটোকে অনিদ্রায় প্রখর করে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কখন যে সে আবার ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ে কিছু খেয়াল রাখে না।

এক ঘুম পরে যখন সে দেয়ালের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফেরে, দেখতে পায়, মেঝের উপর খড়ের বিছানা বিছিয়ে মহীপতি প্রদীপের আলোয় বসে বই পড়ছে। ঋজু মেরুদণ্ড, বসবার ভঙ্গিটা তেজে উদ্দীপ্ত, পরুষ ও প্রশস্ত। বাতির স্তিমিত আলো তার কপালে

এসে পড়েছে। তরুণ মুখখানি মনোনিবেশের গভীরতায় অতিমাত্রায় শান্ত ও সমাহিত, খোলা পিঠের এক পাশ দিয়ে মোটা পৈতে দেখা যাচ্ছে। তার স্বামীব এই তপোদীপ্ত কঠোর সৌন্দর্য ললিতার কাছে একটা প্রবল বিস্ময় বলে মনে হয়। ভক্তিতে ও বশ্যতায় তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই বিচ্ছেদের নদী কি কোনোদিন উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না?

তাব বিধবা বড়ো-জা সেদিন তাকে বলেছিলো: ছাই শাস্ত্র পড়ছে! তুই একটা মূর্তিমান মোহমুদ্গব হয়ে ওব মাথাব ওপব ভেঙে পড়তে পারিস না?

দিদিব বলবাব ভঙ্গিতে ললিতা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

—তা ছাড়া আব কী! যত শাস্ত্রই গিলুক না কেন, কিছুই ওর শিক্ষা হয় নি। স্ত্রী ছেড়ে পুঁথির কতগুলি শুকনো পাতাই ওর কাছে বড়ো হলো! বাঁদব, আস্ত একটা গাছ-বাঁদর। পূর্বপুরুষের ল্যাজটা টিকি হয়ে ওর মাথায় ঝুলছে।

ললিতা তার অনামিকায় আঁচলের খুঁটটা জড়াতে লাগলো।

—হ্যাঁ, জোব কবে তোব দাবি জাহির করতে হবে। স্ত্রীর অধিকার তুই ছাডবি কেন? পুঁথি-পত্র ছিঁড়ে-ছিটিয়ে তুই ছত্রখান করে দিবি। তপস্যা? আব তুই যে তার সিদ্ধি!

ললিতার মুখে কথা নেই।

—সে যে কত অসহায়, তা তুই বুঝতে পারিস না? বহুদিনের অভ্যেসে সে এমনি কৃত্রিম, একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। একটা নিয়ম মেনে চলতে-চলতে সে-ই এখন একটা ব্যাকবণের সূত্রেব মতো কঠিন হয়ে গেছে। তাব আর নড়-চড় নেই। তুই তার জীবনের প্রথম কাব্যোদয়, ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন তুই ভেঙে দিবি, তারি আশায় সে বসে আছে। তুই তাকে মুক্তি না দিলে সে যায় কোথায়?

ললিতাকে কাছে টেনে এনে বড়ো-জা বললে: আমরা বড়ো বেশি স্বার্থপর, প্রথম থেকেই কেবল আমরা হাত ভরে পেতে চাই—

সহজে কিছু বিসর্জন করতে পারি না। ভালোবাসার জন্যে অপেক্ষা করবার আমাদের সময় কই? ভালোবাসার চাইতেও স্বামী আমাদের অনেক বড়ো। বলতে-বলতে চোখ তাব জলে আবছা হ'য়ে এলো।

কিন্তু অসম্ভব, সমস্ত দেহ চক্ষুষ্মান্ করে স্বামীর প্রতীক্ষায় একাকিনী জেগে থাকা ছাড়া কিছুই ললিতার কববাব নেই। মনে প্রাণে অপরিচয়ের জড়িমা ক্রমশ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। যে-দেবতার সন্ধানে স্বামী দিবারাত্রি ব্যাকুল, সে-দেবতা কি কেবল তাঁরই? তার পক্ষে কি কোনো বরদাতা দেবতার আনুকূল্য থাকবে না? তার এই অবিচল ও আপ্রাণ প্রতীক্ষারই কি কোনো ফল নেই?

॥ তিন ॥

অথচ এততেও তার স্বামীর প্রতি বিরাগ আসে না। এমন সবল ব্যক্তিত্ব ও তেজোময় অসান্নিধ্য অলক্ষ্যে তাকে মহীপতির প্রতি আকৃষ্টই করতে থাকে। নিজেকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ভেবে, কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত করে স্বামীকে যে অবারিত স্থান ছেড়ে দেয় তার কোনো অনুষ্ঠানেই তার এতোটুকু বাধা পড়ে না। উপেক্ষা তো দূরের কথা, ললিতা গোপনে মনে মনে তার এই স্বামীকেই ধ্যান করছে।

ধ্যান করছে তাঁর প্রথম পদস্খলনের মুহূর্তটিকে। যেদিন দেবতার আশীর্বাদেই সমস্ত শাস্ত্রের অসারতা তার দুই বিস্ময়বিস্তৃত কালো চোখের অপার আলোয় তার কাছে প্রথম ধরা পড়বে। যেদিন তিনি বুঝবেন, মানুষের মন্দিরেই দেবতার প্রসন্ন অধিষ্ঠান, প্রেমের অভিষেকেই যাঁর প্রতিষ্ঠা।

সকালবেলা স্নান করে তসরের কাপড় পরে, মহীপতি যখন পূজার ঘরে গিয়ে দুই চোখ বুজে অন্ধকারে দেবতার সন্ধান করে, তখন জানলার ছোট্ট একটি ফাঁকে দুই আয়ত চক্ষু মেলে ললিতা তার স্বামীর সেই ধ্যানগম্ভীর, সুন্দর মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকে। পূজায় সমাসীন সেই নিশ্চল নিঃশব্দ মূর্তিটাই তার একেক সময়ে দেবতার দেহময় আবির্ভাব বলে মনে হয়। কিন্তু ঘুলঘুলি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে তার ভারি লজ্জা করে, অলক্ষ্যে যে স্বামীর সহানুভূতি কামনা করে বলেই তার এই দীনতা তাকে আঘাত করতে থাকে। এমন স্বামী পেয়েও যদি যে কৃচ্ছ্রসাধিকা তপশ্চারিণী না হতে পারে তো সে হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছিলো কেন? জন্মে জন্মে স্বামীর অনুগমন করবে বলেই তো।

হ্যাঁ, এই সহানুভূতি তো তিনি তারো কাছ থেকে আশা করতে পারেন, তারো বা কেন এই দুর্ব্বল কৃপণতা! সে-ই বা কেন নিজে থেকে স্বামীর এই আধ্যাত্মিক সঙ্গলাভের জন্যে অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হবে না? মহীপতি তার সেই ধ্যানময় প্রদীপ্ত ভঙ্গি দিয়ে ললিতাকে যেন কেবল তাই জিগগেস করছে।

ললিতার মধ্যে মহীপতির বৈরাগ্য ধীরে ধীরে সংক্রামিত হতে লাগলো। নিজেকে যে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ করে আনলে। আজকাল চুল বাঁধবার বেলায় তার বড়োজাকে সে এড়িয়ে যায়; কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে এলে বলে: সন্নেসির স্ত্রী, মাথায় জটা রাখবো, দিদি।

দিদি হেসে বলে: সন্নেসির স্ত্রী তো শুধু সন্নেসিনি তো নয়।

ওতে আবার তফাৎ কী।

—তুই আসলে স্ত্রী, ললিতা, সন্নেসিনিটা তোর ভেক।

ললিতা মুখ গম্ভীর করে বলে: আমরা যে প্রতিমা পূজো করি আসলে তো ওটা দেবতা নয়, দেবতাকে ভাববার একটা সহায়মাত্র। এই প্রতিমার মাঝেই কেউ-কেউ একদিন স্বয়ং দেবতাকে দেখতে পান।

দিদি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে: তাতে কী হ'লো?

—তেমনি শুক্‌নো একটা অনুষ্ঠান করতে করতে অন্তরে পবিত্রতা পেয়ে যাবো হয়তো। কথা কয়টি বলে লজ্জায় ও খুশিতে ললিতার মুখ ভরে ওঠে।

দিদি বলে: এতো কথা তুই শিখলি কোত্থেকে? ঠাকুরপো বুঝি তোকে শাস্ত্র পড়াতে শুরু করেছে?

ললিতা চোখ তুলে বলে: পড়তে আর কী পারলাম। আমার এ কথা এমনি কেমন যেন মনে হচ্ছে, দিদি।

তার হাত ধরে এক হেঁচকা টান মেরে দিদি বলে: তোর আর

এতো ঢং করতে হবে না, ছারকপালি। সোনার থালায় আর এমনি তোর খুদের জাউ খেতে হবে না। - নে, ওঠ, চুলগুলি আঠা হয়ে গেছে।

ললিতা বলে : তোমার আর এমনি সাজ-সরঞ্জাম করে চুল বেঁধে দিতে হবে না। আমি নিজেই পারবো।

শাড়িটা দিনে দিনে ধূলো জমে-জমে গেরুয়া রঙ ধরতে থাকে, ননদরা আসে টিপ্পনি কাটতে।

ললিতা বলে : ওটা হচ্ছে সহধর্মিতার পাকা রঙ, ময়লা নয় যে জলে ধুয়ে যাবে।

—সে কী কথা, বৌদি? ননদরা সমস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে : নতুন বউ, তোমার এ কী ছিরি! লোকে বলবে কী?

শুকনো মুখে হাসির ক্ষীণ একটি রেখা এঁকে ললিতা বলে : লোকে যদি দেখতে পায়, দেখবে এ একরকম নতুন দীক্ষা। সব কিছু নতুনত্বেই লোকের চোখ টাটায়—সে লোকের চোখের দোষ।

ছোট ননদ লক্ষ্মীর বড়ো সাজবার সখ। সামান্য বেণীর একটা রিবন নিয়েই তার কতো স্ফূর্তি। তার সামনে ললিতা তার বাক্সটা খুলে ধরলো—তার সাবান-স্নো, পমেটম-পাউডার পাট করে সাজানো। থাকে থাকে তার শাড়ি ব্লাউজ। লক্ষ্মীকে বললে, নেবে?

বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে চোখ বড়ো করে, লক্ষ্মী বললে, কোনটা বৌদি?

—যেটা তোমার ইচ্ছে।

—সব? বাক্সের ওপর লক্ষ্মী একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

—হ্যাঁ, সব।

শাড়ি-ব্লাউজগুলির যে তার মাপে খুব জুৎসই হ'বে ততোটা লক্ষ্মী আশা করে না। তাই দু'হাতে অন্যান্য উপাদেয় জিনিসগুলি বেছে-কুড়িয়ে সে চোঁচা চম্পট দিলে।

এমনি করে দিনে দিনে ললিতা নিজেকে নিবিয়ে আনতে লাগলো। তার উপস্থিতিটা স্তিমিত করে আনলেই যেন সে স্বামীর সঙ্গে সমান একটা জায়গা খুঁজে পাবে। তার এই ভোগ-বিরতির মাঝেই যেন স্বামীর স্নেহস্পর্শরস পুঞ্জিত হ'য়ে আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক বলেই এত স্পষ্ট যে, সংসারের চোখ উঠলো জ্বালা করে। ললিতার এই সজ্জা-বৈরাগ্যের কী যে নিকটতম কারণ তা ও সবাই অনায়াসে ধরে ফেলল।

মহীপতির উপর আবার চললো কটুভাষ শাসন, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও তিক্ত গঞ্জনা। এবং এই সমস্তের মূলেও যে ললিতারই অস্তিত্বের স্থূল সঙ্কেত আছে তাতেও মহীপতির বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।

তার মা তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন, তোর ফুঁক-মন্তর নিয়ে তুই থাক, কে তোকে কী বলতে আসছে? কিন্তু বউয়ের দিকেও তো মুখ তুলে চাইতে হয়? এ কী অন্যায় কথা! বেচারি দিন-দিন কী-রকম শুকিয়ে যাচ্ছে দেখেছিস?

মহীপতি সেখান থেকে চলে যেতে-যেতে বললে, কে মুটোচ্ছে না শুকোচ্ছে তা দেখবার আমার সময় নেই।

মা তার পথ আটকিয়ে বল্‌লেন, তাই বলে তুই তাকে হেনস্তা করবি নাকি?

মহীপতি নির্মম মুখভঙ্গি করে বললে,—তাকে নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে হবে এমনো কোনো কথা ছিলো না। জোর করে তোমরা ওকে আমার কাঁধে চাপিয়েছ, ভেবেছিলে হাড়িকাঠে মাথা পেতে আমিও নির্বিবাদে বলি হয়ে যাবো। তা হবার নয়, মা।

মহীপতির পিছনে মাও পাশের ঘরে চলে এলেন। চাপা গলায় বললেন,—সে কী কথা? মন্ত্র পড়ে নারায়ণ সাক্ষী করে তুই ওকে বিয়ে করিস নি?

কোন জায়গায় আঘাত করে মা তাকে নরম করতে চাচ্ছেন, বুঝতে পেরে মহীপতি একটু হাসলে। বললে,—করেছিলাম, কিন্তু

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কর্তব্য তার সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা কোনো মন্ত্র নেই। লোক-বিশেষে তা একটু স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। তোমরা তো স্ত্রীকে সহধর্মিণী দেখতে চাও না- -তোমাকে কী বলবো বলো?

মা বল্‌লেন,—তাই বলে ঐটুকু কচি মেয়ে তোর সঙ্গে উপোস করে শুকিয়ে মরবে নাকি?

বলিষ্ঠ, বিশাল বাহু তুলে মহীপতি বললে,—এই যেমন আমি শুকিয়ে মরছি। তোমরা চেয়েছিলে বউ ঘরে এনে আমাকে একটি হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া বানিয়ে তুলবে, তোমাদের সেই মিথ্যে আশাকে আরো মিথ্যে করবার জন্যেই বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম। পুরাকালে অপ্সরীদের উৎপাতে মুনিদের ধ্যান ভেঙেছে শোনা যায়, কিন্তু সেটা নিতান্তই অসভ্য পুরাকাল বলে। স্ত্রীজাতি যে কোনো ধর্ম্মাচরণেই বিঘ্ন নয়, এমন একটা দৃষ্টান্ত দেখাবার দরকার পড়েছে। বলে সমস্ত শরীরে কঠোর একটা ভঙ্গি করে মহীপতি তার পূজোর আসনে গিয়ে বসে পড়লো।

ছোঁয়া বাঁচিয়ে তার পাশে বসে মা বল্‌লেন,—এমন একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে শেষকালে তুই একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করবি?

মহীপতি অসহিষ্ণু গলায় বললে—এখন আমার পূজোর সময়, মিছিমিছি বিরক্ত করতে এসো না। সর্বনাশ তুমি কাকে বল্‌ছ? জীবনে যা চিরন্তন সত্য, সেই পথেরই দিকে আমি ওকে সঙ্কেত করছি। যাকে তোমরা আমার নিষ্ঠুরতা বল্‌ছ, তাতেই ওর মনে একদিন অনুভূতির আলো জ্বলে উঠবে।

— কিন্তু ঐটুকু মেয়ে, ধর্মের কী বুঝবে বল্‌?

—যদি বিয়ে বুঝে থাকে, ধর্মও বুঝবে। এবং নাই বা যদি বোঝে, তার জন্যে আমি নিজেকে ভ্রষ্ট করতে পারি না। কঠিন সাধনায় এইটুকু যদি না ত্যাগ করতে পারলাম—মহীপতি ঠোঁট বেঁকিয়ে সামান্য একটু হাসলো।

মা রেগে বললেন—আর বিয়ে করে তাচ্ছিল্য করা-ই তোর বড়ো ধর্ম ?

—তাচ্ছিল্য ? মহীপতি ঝাঁজালো গলায় বললে,—কেন আমি ওকে তাচ্ছিল্য করতে যাবো ? তাই ও তোমাদের বলছে নাকি ?

—কেন, ও কেন তা বলতে যাবে ? ময়লা কাপড়-চোপড় পরে, কেমন উদাসের মতো বসে থাকে। মুখখানি যেন ছুটে পড়ছে। আমরা বুঝতে পারি না ?

—তা আমি কী করবো বলো ? মহীপতি নির্লিপ্ত গলায় বললে, —সংসারে তার অগাধ সুবিধে—কোনোখানেই কোনো কিছু ত্রুটি আছে বলে তো মনে হয় না। খাবার পরবার তার ভাবনা কী ! যাও, এখন যাও, আমি এবার পূজো করবো।

মা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। ছেলের সুমতির জন্যে ষষ্ঠীতলায় সিঁদুর মানৎ করা ছাড়া অগত্যা আর কোনো পথ তিনি দেখলেন না।

বড়ো-জা ললিতাকে কাছে টেনে নিয়ে কৃত্রিম শাসনের সুরে মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, তুই-ই বা কেন ছেড়ে কথা কইবি ? তোর ভাগে কেন তুই দাঁত বসাবি নে ?

ললিতা লজ্জায় দুর্বল একটু হাসলো।

তার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিদি বললে,—অমন লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকলে চলবে না আর। দেখিস না, তোর সন্নেসি-ঠাকুর কোন দেবীর পূজো করে ? হাতে তার খড়গ, লকলক করছে জিভ, গলায় নরমুণ্ডের মালা, একেবারে উলঙ্গ, রাক্ষুসী মূর্তি। হাসছিস কী ?

দিদির হাতটা চেপে ধরে ললিতা হেসে বললে—আমার ভয় করছে, দিদি।

—তোর ভয় কিসের ? ভয় করবে তো ও। একবার দাঁড়া দেখি অমনি মোহমুদ্গর নিয়ে, পায়ের তলায় শিবঠাকুরের মতো অমনি দেখিস চিৎপাত হ'য়ে লুটিয়ে পড়বে। সংকোচের ঘোমটা

সরিয়ে বিদ্রোহে অমন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দে, দেখবি ভক্তের নেশা আপনি কখন ছুটে গেছে।

গাঢ় গলায় ললিতা বললে,—নিজে ভক্ত হওয়া ছাড়া আমিই বা আর কী করতে পারি, বলো?

—তুই ভক্ত হবি? কার? দিদি শক্ত করে ললিতার একখানি হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো: অত্যাচারীকে ভক্তি করতে যাবি? তুই?

—হ্যাঁ, ওকে তুমি অত্যাচার বলো নাকি?

—একশোবার! তবু এ বীরের অত্যাচার নয়, কাপুরুষের। আমি হলে এ অপমান ককখনো সইতাম না।

ললিতা বললে,—কী করতে?

দিদি হাতের একটা ভঙ্গি করে বললে,—তার পূজো পত্তর ছত্রখান করে দিতাম, পাথর-পুতুল গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেলতাম, এমন নিশ্চিন্তে তাকে বাবুগিরি করতে দিতাম না।

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে ললিতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

তাকে কোলের কাছে টেনে এনে দিদি বললে,—তুইও তাই কর্। এমন নিশ্চিন্ত আরামে তাকে এমনি পুতুল নিয়ে খেলতে দিসনে। সব ভেঙ্গেচুরে নষ্ট করে দে, তাকে ছুঁয়ে-ছেনে অশুচি করে তোল্, তার পূজোর নেশা ছুটিয়ে দে। প্রশ্রয় পেতে-পেতে বড্ড ও বেড়ে গেছে।

ললিতা চম্‌কে উঠলো: তাই বলে মূর্তি ভাঙবো, কী বলছ দিদি? দেবতা না?

—ওরা কি তোর থেকেও বড়ো দেবতা নাকি? ওরা তো কতকগুলি প্রাণহীন পুতুল, খালি পূজো নেয়, পূজো ফিরিয়ে দেয় না। তুই আমার কথা শোন্, ললিতা। ওর পূজোকে তুই অপবিত্র করে দে। ওকে অপবিত্র করতে পারলেই দেখবি, তুই ওর কাছে দেবী হয়ে গেছিস।

অনর্থক। স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ললিতা তার একটি আঙুলও কখনো তুলতে পারে না। বরং তাঁর সমবেদনা পাবে ভেবে আচার-ব্যবহারে অলক্ষ্যে সে তাঁর সমান হয়ে উঠতে চায়।

মহীপতি যখন বিকেলের দিকে বাড়ি থাকে না, ললিতা এক ফাঁকে তাঁর পূজোর ঘরটিতে ঢুকে পড়ে। নিরালা ছোট একটি ঘর, শ্বেত-পাথরের মেঝেটি ভারি ঠাণ্ডা, ঘরটির বদ্ধ আবহাওয়াটা যেন কার দেহাতীত উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। প্রতিটি বায়ুকণায় যেন কার নিশ্বাসের তাপ পাওয়া যায়। এই ঘরে ঢুকেই সে যেন তার স্বামীর বলিষ্ঠ আশ্রয়ের মধ্যে চলে আসে। এই ঘরটিতে এসে নিজেকে আর ললিতাব একা মনে হয় না, নিমেষে তার সমস্ত শূন্যতার ক্লান্তি যেন মুছে গেলো!

সংসার এখানে নীরব, কোলাহলের পর নিবিড় ক্ষান্তি, উৎসবের শেষে গাঢ় অপূর্ণতা। আবিল কুয়াসার অন্তরালে এক টুকরো নির্মল, প্রসন্ন আকাশ। সমস্ত দিনের তুচ্ছতার পর এখানে যেন একটি বিশালতার স্বাদ। ললিতা খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝের উপর অভি-ভূতের মতো বসে থাকে। নিজের সঙ্কীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ আর্তনাদগুলি যেন এখানে কা'র পরম আহ্বানের গভীর নিঃশব্দতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যায়। নিজের কথা আর তাব কিছু মনেই থাকে না।

তাবপর সে পরিচ্ছন্ন হাতে ঘরের মার্জনা করতে বসে। কোথায় ধুলো পড়ে আছে, তাই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। বাতিতে তেল নেই, তেল নিয়ে আসে, সলতে পাকায়, ধুনো, ধূপের কাঠি, দিয়া-শলায়ের বাক্সটি পর্যন্ত হাতের কাছে রেখে দেয়। ছবিটা যেখানে কাৎ হয়ে পড়েছে, সেটা ঠিক করে, আঁচল দিয়ে কাচের উপর জমা ধুলোর পর্দাটা মুছে ফেলে। আর যে সে কী করতে পারে, কিছু সে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ঘর ছেড়ে বিদায় হবার আগে কি মনে করে হঠাৎ সে সেই মূর্তিমালার সামনে হেঁট হয়ে প্রণাম

করে। কী যে অব্যক্ত প্রার্থনা তার সেই অবনমিত ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হয়ে ওঠে, স্পষ্ট করে নিজেই সে তার অর্থ বোঝে না। স্বামীকেই সে এই সংসারের স্থূল পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চায়, না, নিজেকেই স্বামীর সমানুবর্ত্তী করবার যোগ্যতা কামনা করে, তা দেবতারাই বলতে পারেন।

তক্ষুনি আসে সংসারের ডাক, জবরদস্ত তার দাবি। ললিতাকে আবার অন্য সুরে মন বাঁধতে হয়। কিন্তু শত খাটা-খাটনি, শত কলরব-কোলাহলের ওপারে একটি বিরহধূসর নীরব আকাশ তার চোখের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকে। বাইরের হাসিখুশির পিছনে থাকে একটি করুণতরো ক্লান্তি।

তবু যা হোক দিনের বেলা এটা-ওটা কাজ করে এর-ওর সঙ্গে কথা বলে খানিকটা হালকা হাওয়া যায়, কিন্তু রাত করে যখন সে তার ঘরে ফিরে মহীপতির বাড়ি-ফেরার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করে, তখন কতোক্ষণ যেন সারা আকাশ গুমোট, ঘোলাটে হয়ে থাকে। ললিতা চুপ করে জানলায় এসে বসে। পাড়াগেঁয়ে শহর অনেক আগেই নিশুতি হয়ে পড়েছে। ওখানে ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ, এখানে জ্বলছে জোনাকি। পুকুরের ধারে দূরে ডাকছে কটা শেয়াল। নেবু-ফুলের মিঠে একটি গন্ধ আসছে। সারা আকাশ অন্ধকার, সেই অন্ধকারে বড়ো-বড়ো ডাল-পালা মেলে বিরাট একটা বট নিঝুম হ'য়ে দাঁড়িয়ে, পাতার আড়াল থেকে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে মৃদু-মৃদু পাখার ঝাপট।- কত জ্বলছে তারা, কতো দূর, কত না জানি তারা দূরে।

একা-একা চুপ করে বসে ললিতা কী যে ভাবে নিজেই সে তা বুঝতে পারে না, তার মনে এই অন্ধকারের জোয়ারের মতো ভাবনা আসে। তার মনে হয় এই অন্ধকারের পিছনে যেন কী আছে! দিনের আলোতেও তাকে স্পষ্ট ধরা যায় না। আকাশকে মনে হয় একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র। এই পারে পৃথিবী, অন্য পারে বা আরেকটা

কোন তারা! যেন এই সমুদ্রের তরঙ্গমালার শেষ নেই। ভাসমান দ্বীপগুলির তট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্রোতে আবর্তে ফেনিল হয়ে উঠেছে! ঐ যে গাছটা, ও-ও যেন একেবারে চুপ করে নেই। তারো যেন কি একটা ভাষা আছে। কাছাকাছি ঐ যে কাদের বাড়িতে শিশুকণ্ঠে একটা কান্না ফুটে উঠলো, তা-ও যেন কী দূর দিনের একটি ক্ষীণ ইসারা! চারদিকে চেয়ে-চেয়ে ললিতা যেন নিজের মাঝে নিজেরই কোনো থই পায় না। কোথায় যেন কী আছে! কোথায় যেন কী আছে! সেই থাকার নিবিড় সত্যই যেন সে নিজেরই হৃৎস্পন্দনে অস্পষ্ট অনুভব করতে পারে। আশ্চর্য্য!

তারপর দরজা ঠেলে মহীপতি যখন ঘরে ঢোকে, তখন ললিতার চিন্তার নির্জনতা ভেঙে যায় হঠাৎ। আস্তে-আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। নিজের উপস্থিতিটা যতোদূর সম্ভব খর্ব, সঙ্কুচিত করতে পারলেই তার তৃপ্তি বোধ হয়। সে যেন তার স্বামীর বিরাট উপলব্ধির সাধনায় এতটুকু না বাধা হয় কোনোখানে! নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে অগত্যা সে ঘুমিয়ে পড়ে—ঘুমিয়ে পড়ে সে শব্দস্পর্শহীনতার গভীর সমুদ্রে।

মহীপতির এই অদম্য কঠোরতা তারো মনের মধ্যে যেন ক্রিয়া করতে লাগলো। সমস্ত স্বপ্নরঞ্জিত প্রতীক্ষা যেন কোন এক বৃহত্তর প্রাপ্তির আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। আর এই কঠোর সংযমের জন্যেই তো মহীপতিকে তার এতো ভাল লাগে। তার বিদ্রোহ স্বামীর প্রতি না এসে, গোপনে আসে এই আপাতশোভন, স্থূল সংসার-সন্নিবেশের প্রতি। যে-সংসার আকাশকে রেখেছে আড়াল করে, যে-সংসারে তুচ্ছ দেহধারণের অতিরিক্ত কোনো মহত্তর সার্থকতা নেই।

॥ চার ॥

মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কিছু একটা নিয়ে অশান্তি হচ্ছে, এমনি একটা উড়ো খবর অতি-পল্লবিত হয়ে ধরণীবাবুর কানে উঠলো।

একখানা চিঠিতে মেয়েকে তিনি অত্যন্ত কাছে ডেকে এনে, যেন খুব চুপিচুপি, সমান বন্ধুর মতো জিগ্‌গেস কর্‌লেন : কেমন আছিস, ললিতা?

উত্তরে ললিতা এক দীর্ঘ চিঠি পাঠালো :

বেশ ভালোই আছি, বাবা! এই পাড়াগেঁয়ে শহর আমার খুব ভালো লাগে। শহরের সমস্ত রকম সুবিধে তো পাওয়া যায়ই, আবার গ্রাম দেখা যায়। কলকাতায় থাকতে কখনো এত বড়ো আকাশ দেখিনি, জ্যোৎস্না কাকে বলে যদি দেখতে চাও, তবে আমাদের বাড়ির মাঠে এসে দাঁড়াও। কলকাতার চাঁদগুলি কী রোগা, ফ্যাকাসে। ওখানকার আকাশ কেমন ঘুপসি, ধোঁয়াটে, সব সময়ে মুখ ভার! সত্যিকার আকাশের কী যে রঙ, কী তার চাউনি, এখানে এসে এই প্রথম বুঝলাম। আর এখানকার অন্ধকারও বা কী চমৎকার! কলকাতায় অন্ধকার কী, তুমি তা কল্পনা কর্‌তে পারো? এখানে সন্ধে হতে-না-হতেই মাঝরাত, অন্ধকার যেন বাঁধভাঙা নদীর জলের মতো শব্দ করে নেমে আসে। আর কী শান্তি, কী স্তব্ধতা এখানে! স্তব্ধতা শুনতে-শুনতে ঘুমুই, স্তব্ধতা শুনতে-শুনতে জাগি।

আর কত রাজ্যের পাখি যে এখানে ডাকে। পুকুরে কত যে মাছ, বাগানে কত যে ফুল! বকফুল, আকন্দফুল, নন্দদুলাল ফুল—কোনোদিন এ-সব আমার তা হলে আর দেখাই হতো না।

আমার জন্যে মিছিমিছি তুমি ভাবছ, বাবা। সত্যি আমি বেশ ভালো আছি। এখানে এসে মাকে আবার ফিরে পেলাম। শ্বশুর-ঠাকুব আমাকে অফুবন্ত স্নেহ করেন। জা-রা, ননদরা আমাকে ভালোবাসে। যখন যা চাই, কিছুই আমার আটকায় না কখনো। টাকা-কড়ি? এমন কোনো আমার অভাব নেই যার জন্যে হাত-খরচের টাকা লাগবে। জামা-কাপড়? আমার বাক্স খুলে দেখে যাও, থাকে-থাকে কত এখনো মজুত আছে। দরকারের অনেক—অনেক বেশি, দুহাতে বিলিয়ে দিতে পর্যন্ত বাধবে না।

আমার এতোটুকু কোনো কষ্ট নেই। এখানে শুনেছি ম্যালেরিয়া, কিন্তু একদিনও আমি জ্বরে পড়িনি। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।

তুমি আছ কেমন? এত দেরি করে চিঠি লেখ কেন? নটু কেমন আছে? ওকে চিঠি লিখতে বোলো। আমার অনেক প্রণাম নাও। ইতি।

চিঠি পেয়ে ধরণীবাবু স্বভাবতোই চিন্তিত হলেন। স্বভাবতোই, কেননা ললিতা কখনো এত বেশি কথা কয় না। সে যে কষ্টে নেই—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাটা বারে-বারে জানানোর জন্যেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। চিঠির সুরে কোথায় যেন অব্যক্ত একটি ব্যথা আছে। ললিতাকে দেখবার জন্যে তাঁর মন কেঁদে উঠলো।

আবার তিনি চিঠি লিখলেন: আমার কাছে একবারটি এখন আসবি, মা?

কথা শুনে ললিতা একেবারে বাপের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর-কি: শ্বশুর-ঠাকুরকে শিগগির চিঠি দাও বাবা, আমার আর এখানে একটুও ভালো লাগছে না। তোমার আসবার তো এখন সুবিধে হবে না, কিন্তু শ্বশুর-মশায়ের মত পেলে লোকের জন্যে আটকাবে না—আমি যে-করে হোক তার ব্যবস্থা করবো। সত্যি বাবা, তোমার কাছে যাবার জন্যে ভারি ইচ্ছে করছে। কতোদিন যে তোমাদের দেখি নি।

কাজে-কাজেই জগদীশবাবুর নামে চিঠি এলো।

গম্ভীর হয়ে বসে খানিকক্ষণ তিনি কী চিন্তা করলেন, তারপর চিঠি লিখে দিতে তাঁর দেরি হলো না।

অন্তঃপুরে এলে মহীপতির মা তাঁকে জিগগেস করলেনঃ বেয়াইয়ের চিঠির কী জবাব দিলে ? আমি বলি কি, বউমাকে কয়েক দিনের জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া যাক।

জগদীশবাবু চম্‌কে উঠলেনঃ কেন ?

—দেখছো না ওর চেহারা ! শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে।

—কেন, ওকে তোমরা খেতে দাও না নাকি ?

—দিলে কী হবে, নিজেই ও কিছু মুখে তুলতে চায় না। মাছ খাবে না, মাংস খাবে না, সেধে কিছু খাওয়াতে গেলেই, ওর খিদে নেই। মুখে ঐ এক বুলি। মহীপতির মা চিন্তিত সুরে আরো বল্‌তে লাগলেনঃ আগে কেমন মেয়েটার ফুর্তি ছিলো, এখন দিন-দিন কেমন বুড়োটে হয়ে পড়ছে। কারু সঙ্গে আর মেশে না, একা-একা চুপ করে বসে থাকে। সংসারের কাজকর্ম করে, কোথাও এতোটুকু প্রাণ নেই।

জগদীশবাবু গম্ভীর মুখে শুধু একটা আওয়াজ করলেনঃ হুঁ !

—বেয়াইকে চিঠি লিখে দাও, মেয়ে তারা এসে নিয়ে যাক। বাপের কাছে গিয়ে ক'দিন এখন থাকতে পারলে ওর ভালো হ'তো।

- আমি এইমাত্র চিঠি লিখে দিলাম।

—কী লিখলে ?

—লিখলাম, এখন বউমার যাওয়া হতে পারে না।

—সে কী কথা ? মহীপতির মা প্রতিবাদ করে উঠলেনঃ ও-কথা লিখতে গেলে কেন ? এখানে এমনি মন-মরা হয়ে থাকতে-থাকতে শেষে একদিন ও ভারি হাতে অসুখে পড়বে দেখো। না, না, ওকে পাঠিয়ে দাও, কদিন ঘুরে আসুক।

—তুমি কী বোঝ বলো তো? জগদীশবাবুর স্বর রুক্ষ: এত অধৈর্য হলে কী চলে? এখুনি ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলে সমস্ত সুর যাবে কেটে। তবু এখনো মহীর চারিদিকে যা-হোক একটা দেয়াল আছে, সে দেয়াল তুলে নিলে তখুনি আবার ফাঁকা আকাশ। অমনি সব মাটি।

—ছাই! মহীপতির মা বেজার মুখে বললেন,—সে-গুড়ে বালি। বউকে এখন একবার দূরে সরিয়ে দিলে যদি মনের হাওয়া বদলায়।

জগদীশবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,—স্ত্রীবুদ্ধি তো, দূরদর্শিতা আসবে কোত্থেকে। সবুর করো, দিনে-দিনে কতো সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটতে-ঘটতে তবে একটা যুগের পরিবর্তন হয়। ছোট ছেলে যে দেখতে-দেখতে কেমন বড়ো হয়ে ওঠে, তুমি চোখ দিয়ে তার ধাপের পর ধাপ লক্ষ্য করতে পারো? সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, সময়ই সব ব্যবস্থা করবে। বউমাকে এখন বাপের বাড়ি যদি পাঠাও, তবে পাষণ্ডটার উন্মাদ-রোগের উপসর্গগুলি আরো উৎকট হতে থাকবে না?

মহীপতির মা বিষণ্ণ মুখে বল্‌লেন,—তুমি মহীকে চেনো না। তাকে তার এই সন্ন্যাসধর্ম থেকে ছাড়িয়ে আনবো বলেই আমরা তার বিয়ে দিয়েছি, এমনি একটা ধারণা থেকে তার গোঁ আরো বেড়ে গেছে। এক চুলও সে এদিক-ওদিক হবে না, এই হয়েছে তার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে করেও যে সে তার আগের পূজো-আচ্চা ছাড়েনি, এই তার অহঙ্কার।

—এ যে দেখছি, রত্নাকরের পাপের জন্যে তার বাপ-মাকে দায়ী করা। আমরা তার বিয়ে দিয়েছি? বেটা ধেড়ে জোয়ান্, আইনের চোখে কবে থেকে সাবালক হয়েছে—আমরা দিয়েছি ওর বিয়ে? জগদীশবাবু খেপে উঠলেন: বিয়ে ও করেনি? দাঁড়াও, তুমি ভেবো না। পাষণ্ডকে আমি ঢিট না করেছি তো কী! বলে জগদীশবাবু মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন: সামান্য মাটির বাসনের

ছোঁয়ায় কঠিন পাথরই একদিন ক্ষয় পায়, আর এ তো—তুমি ভেবো না কিছু। সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকো। সময়ের চাকা অবিরাম ঘুরে চলেছে।

তার আখড়া থেকে রাত করে ফিরে এসে মহীপতি দেখতে পেলো, ললিতা বালিশে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দুঃখের প্রাবল্যে তার সমস্ত শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। রুক্ষ, আবাঁধা চুলগুলি পিঠময় এলোমেলো। শাড়িটা এখানে-ওখানে রাশীভূত।

কান্নার বিহ্বলতায় মহীপতি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। অসহায়তার থেকে এর আন্তরিকতা এমন প্রচুর যে মহীপতি খাটের দিকে না এগিয়ে পারলো না। জিগগেস করলে: কী হলো? কাঁদছো কেন?

ললিতা মানা মানলো না। কান্না ছাড়া মুখে তার আর কোনো কথা নেই।

মহীপতি আবার জিগগেস করলে: কেন কাঁদছো, শুনতে পাই না?

বালিশে তেমনি মুখ গুঁজে ললিতা বললে,—আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।

কথা শুনে মহীপতি কতকটা আশ্বস্ত হলো যা-হোক। নির্লিপ্ত গলায় বললে,—বেশ, গেলেই পারো একদিন। কে ধরে রাখছে?

—কিন্তু কার সঙ্গে যাবো?

—তা আমি কী জানি! মহীপতি মেঝের উপর তার আসনে গিয়ে বসলো: মাকে বললেই পারো। লোকজনের ব্যবস্থা সব তাঁরাই করতে পারবেন। দায়িত্ব তো তাঁদের। আমাকে বলে লাভ কী।

—তাঁরা এখন আমাকে পাঠাতে চান না। ললিতা আস্তে-আস্তে মুখখানি কাত করলো।

ঘাড় না ফিরিয়ে মহীপতি জিগগেস করলে: কেন?

কী যে উত্তর দেবে, ললিতা ব্যাকুলভাবে মনের অন্ধকার হাতড়াতে লাগলো। বললে,—জানি না।

—জানো না তো, আমি কী করবো। মহীপতি তার পুঁথি-পত্র ঘাঁটতে বসেছে।

ললিতা বললে,—আমি চলে গেলে সংসারের নাকি অসুবিধে হবে।

মহীপতির উত্তর সংক্ষিপ্ত: তুমি না থাকতেও তো সংসার আমাদের সমানে চলে এসেছে।

মিনিটটাক চুপ করে থেকে ঢোঁক গিলে ললিতা বললে,—তোমার অসুবিধে—

—আমার? মহীপতি ঘাড় ফেরাতে বাধ্য হলো: আমার অসুবিধের জন্যে তোমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না? আমার আবার অসুবিধে কী। আমার কোনো কাজেই তো তোমাকে হাত দিতে দিই না। সত্যি, এই কারণ?

ললিতা বোজা গলায় বললে,—জানি না।

—জানো না তো, চুপ করে থাকো।

কিন্তু চুপ করে ললিতা আজ থাকবে না। আবার এলো কান্নার ঢেউ।

মহীপতি সহসা ধম্‌কে উঠলো: আমার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কী ফল হবে? যারা তোমাকে এখানে ধরে এনে আটক করে রেখেছে, তাদের বলো গে।

কান্নার ঢেউয়ে ললিতার মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে এলো: তোমাকে ছাড়া আর কা'র কাছে বলবো? কে তবে আমার আছে?

মুহূর্তে ঘরের সমস্ত হাওয়া যেন জমে পাথর হয়ে গেলো, এমন ভয়াবহ স্তব্ধতা। স্পষ্টই মহীপতির নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। চেয়ে দেখলো—তার দেহের দৃঢ় পেশীতে ফুটে উঠেছে সতেজ সংযম, যেন খানিকটা আঘাত প্রতিরোধ করার দুর্নমনীয় ভঙ্গি। তার মনের ঘুমন্ত

অন্ধকার যেন ললিতার এই বাক্যচ্ছটায় সহসা বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, চোখে তার সেই অসহ্য বিস্ময়! ললিতার ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো। বেদনার প্রাবল্যে কী করে যে সে হঠাৎ আত্মোদ্‌ঘাটন করে বসলো, তারই অমিতোচ্ছ্বাসে সে এখন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রত্যেক সত্যের অনাবরণেই বুঝি এমন একটা প্রাখর্য আছে, যা চোখ মেলে অনুধাবন করতে গেলে সহসা জ্বালা করে ওঠে।

সেই ক্ষীণতম মুহূর্তটির অপার, অক্ষুণ্ণ স্তব্ধতা যেন ললিতার কাছে তার স্বামীর সুনিবিড় সান্নিধ্যের স্বাদ নিয়ে এলো। উত্তরে কী তিনি বলেন তার শোনবার প্রতীক্ষায় তার দেহের অণু-পরমাণু পর্যন্ত সঙ্গীত-স্পন্দিত হচ্ছে।

মহীপতি স্নিগ্ধস্বরে বললে,—বেশ, এখন চুপ করো, আমি যা-হোক একটা বন্দোবস্ত করবো।

—ঠিক, করবে? আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে তা'লে?

—হ্যাঁ, এখন ঘুমোও। আমাকে এখন আমার কাজ করতে দাও। বলতে-বলতেই ধর্মপ্রাণনার একাগ্রতায় তার ভঙ্গিটা তীক্ষ্ণ, কঠোর হয়ে এলো।

তবু একটি সস্নেহ, সমব্যথিত কথায় স্বামী যে তাকে আশ্বাস দিয়েছে, ললিতার তাই যেন অনেক। যেন তার অন্ধকার রাত্রির একটি মধুর অনিদ্রা। ললিতা স্বামীর কথায় সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে এমনি একটা সুখাবেশের ভঙ্গিতে নিজেকে সে শিথিল করে আনলো। স্বামীর ধ্যানের নিঃশব্দতার সমুদ্রে সে নিজের আর এতোটুকু চিহ্ন রাখলো না।

পরদিন রাত করে মহীপতি আবার বাড়ি ফিরলে ললিতা হাসিমুখে জিগগেস করলে: আমার যাওয়ার কী ব্যবস্থা হলো?

মহীপতির মুখ গাম্ভীর্যে থমথম করছে। বললে,—হ্যাঁ, বাবার কাছে তো একবার সুপারিশ করতে যেতে হবে। মোটেই সময় করতে পারছি না।

—বাবাকে তবে কবে বলবে ?

—দেখি।

মহীপতি ঘরময় পাইচারি করতে লাগলো। আজ ঠিক প্রশান্ত অভিনিবেশের সঙ্গে সে তার পুঁথি-পত্র নিয়ে বসতে পারছে না।

মোটকথা, জগদীশবাবুর কাছে এগোতে তার সঙ্কোচের আর শেষ ছিলো না। নিজে সে নিয়মের অন্ধ আনুগত্য করে-করে বাপকে ক্ষমতার এমন দূর শিখরে এনে বসিয়েছিলো যে তাঁর দিকে তাকানো পর্যন্ত তার অসম্ভব। দু'-দু'বার দরজার চৌকাঠ থেকে সে ফিরে এসেছে। কথাটা যে কী করে পাড়বে, তার অনুকূল ভাষাই সে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু ললিতাকে যখন একবার কথা দিয়েছে, সে-কথার সে অন্তত মর্যাদা রাখবে। ফলাফলের উপর তার হাত নেই, কিন্তু তার যেটুকু সাধ্য, যেটুকু আয়ত্ত, তার অবমাননা করা তাকে মানাবে না। মনে থাকে যেন, সে তাকে কথা দিয়েছে।

আর এ কী অন্যায় চরিত্রদৌর্বল্য! মহীপতি সটান একদিন জগদীশবাবুর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

॥ পাঁচ ॥

জমিদারির খত-খতিয়ান নিয়ে জগদীশবাবু তখন ভারি ব্যস্ত; মহীপতি আস্তে-আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালো। ঘরে লোকজন কেউ নেই—এমন সময়ের জন্যেই মহীপতি এতোক্ষণ আড়ালে থেকে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু কথাটা যে কী করে সুরু করা যায় তারই সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

দরজার কাছে ছায়া পড়তে দেখেও জগদীশবাবু চোখ তুললেন না, অভিনিবেশে এমনি তিনি অটল। গাম্ভীর্য যেন চারদিকে তাঁর দুর্ভেদ্য একটা বর্মের মতো কঠিন; বিরক্তিতে মুখের রেখাগুলি রুক্ষ, ধারালো।

কথা প্রথমটা সুরু করা শক্ত হলেও, কোথায় গিয়ে তা শেষ হতে পারে মহীপতির তা জানা আছে। তার জন্যে সে প্রস্তুত, তার ভঙ্গিটাও তাই সে নরম করে আনলো না।

তবু, গলাটা পরিষ্কার করে মহীপতি বললে—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিলো—

কাগজ পত্র থেকে চোখ না তুলেই জগদীশবাবু বললেন, ভালো কথা, বলো।

মহীপতি আমতা-আমতা করে বললে,—বউকে বাপের বাড়িতে দিন কয়েকের জন্যে রেখে দিলে হয়।

জগদীশবাবু তাকিয়া ফেলে এক ঝটকায় উঠে বসলেন, চশমার কাচের ভিতর দিয়ে তেরছা করে চেয়ে বললেন,—তার ওপর তোমার এত মায়া পড়লো হঠাৎ?

মহীপতি বিনীত হয়েই বললে,—মায়া নয়। আমাকে রোজ সে এই বলে বিরক্ত করছে।

ঠাট্টায় ঠোঁট দুটো একটু বেঁকিয়ে জগদীশবাবু বল্‌লেন—রোজ, প্রতি মুহূর্তে তোমাকে এমনি বিরক্ত করবার জন্যেই তো বউমাকে নিয়ে এসেছি। যাতে তোমার বৈরাগ্যের ওপর রাগ আসে ; যাতে তার সংস্পর্শে তোমার খানিকটা চেতনা হয়। শুনে খুব খুশি হলাম।

—কিন্তু এতে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হচ্ছে।

—হচ্ছে তো? জগদীশবাবু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: তাই তো আমরা চেয়েছিলাম। এবার একটু মানুষিক শান্তির চেষ্টা দেখ। বলে তিনি চশমার নাকিটা আঁট করে বসিয়ে তমস্সুকের দলিলটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

মহীপতি কঠিন হয়ে বললে,—কিন্তু সহজেই একদিন আপনাদের ভুল ভেঙে যাবে।

—একটা বীরের মতো কথা বলেছ বটে, কিন্তু কার কখন ভুল ভাঙে, বড়াই করে তা বলতে যেয়ো না, মহী।

—বেশ, মহীপতি দরজার দিকে মুখ করে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করে বললে—ওকে না সরান, আমাকেই তবে সরে পড়তে হবে।

জগদীশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: শোনো, শোনো, কোথায় তুমি যাবে শুনি? ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করো নি তুমি? স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য নেই?

মহীপতি ফিরে দাঁড়ালো। নিষ্ঠুর কণ্ঠে বল্‌লে,—তার চেয়ে সত্যের প্রতি আমার বড়ো কর্তব্য আছে।

কথা শুনে জগদীশবাবু প্রবল হাসিতে আলোড়িত হয়ে উঠলেন: ও-সব গাঁজাখুরি কথা আর কটা তুমি মুখস্ত করে রেখেছ? সত্য? সত্য তোমার মাথার ঐ টিকিতেই কেবল শোভা পাচ্ছে, তোমার স্ত্রীর শাঁখা সিঁদুরে কোনো সত্যই নেই?

মহীপতি গম্ভীর মুখে বললে,—সে-সব কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে অযথা তর্ক করতে চাই না।

আকস্মিক উত্তেজনায় জগদীশবাবু তক্তপোষ থেকে নিচে নেমে এলেন ; ঝাঁজালো গলায় বললেন,—বিয়ে করে তুমি তোমার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করবে না ? কাপুরুষ, ছোটলোক কোথাকার ! এ তুমি অরাজক দেশ পেয়েছ ? আইন নেই ?

মহীপতি বললে,—আইন তো আমার পক্ষে। স্বামীর কাছে স্ত্রী বড়ো জোর একটা খোরপোষ দাবি করতে পারে, তার জন্যে আমার প্রাপ্য সমস্ত সম্পত্তি ওকে না-হয় দিয়ে যাবো। ও-সবে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

—ও তোমার সম্পত্তি ? দুঃসহ, নিদারুণ রাগে জগদীশবাবুর শরীর স্ফীততরো হয়ে উঠলো : মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও তুমি রোজগার করেছ ?

—কিন্তু আইন, মহীপতি শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বললে—ঐ আইনের জোরেই ও স্বচ্ছন্দে আমার হাতে এসে যেতো।

—বটে ? জগদীশবাবু মহীপতির দিকে দু' পা এগিয়ে এলেন : তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করতে পারি না, ভেবেছ ?

মহীপতি হেসে বললে,—আইনে আপনার সে-ক্ষমতা আছে হয়তো। সে-ক্ষেত্রেও, আমি জানি আপনি আপনার পুত্রবধূর ওপর দয়া করবেন। সংসারে আমার মতো নির্মম আর কয়জন হতে পারে, বলুন ?

অপমানের তীব্রতায় জগদীশবাবুর দুই চোখ থেকে কণা-কণা আগুন ঝরতে লাগলো। কিন্তু কিছু একটা করে বসবার আগেই মহীপতি ঘর থেকে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেই রাত্রে—রাত যখন অন্ধকারে গভীর, অকস্মাৎ শরীরময় স্পর্শের বন্যায় ললিতা ঘুমের ঘোরে বিভোর হয়ে উঠলো। রাত করে যখন সে শুতে আসে, মহীপতি তখন ঘরে ছিলো না, সে কোনো সন্নেসির আখড়ায় গিয়ে থাকবে হয়তো। বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢোকবার যে দরজা, তাতে ললিতা খিল চাপায় নি, কিন্তু সেই

ভেজানো দরজা ঠেলে চুপি-চুপি অপরিচিত কেউ এসে তার প্রতি আবেগে এতটা অমিতব্যয়ী হয়ে উঠবে সেটা ললিতার ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেরো অতীত ছিলো। পরাক্রান্ত, পরুষ-পেশল স্পর্শের ব্যূহ থেকে মুক্ত হবার জন্যে সে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো —আরেকটু হলে সে চেঁচিয়েই উঠতো হয়তো—কিন্তু ভয়ে ও বিস্ময়ে চোখ বড়ো করে সে চেয়ে দেখলে, আর কেউ নয়, অন্ধকারে স্বয়ং দাঁড়িয়ে মহীপতি!

ছি, ছি, ছি—এলোমেলো আঁচল ও অসম্বৃত চুলের রাশ নিয়ে ললিতা উঠলো হাঁপিয়ে: ছি, ছি, ছি, এমন রোমাঞ্চ সে নিজেকে সর্ব্বাঙ্গ ভরে বেশিক্ষণ সম্ভোগ করতে দিলো না! কোথাকার কী সাতঙ্ক কল্পনা তার এই স্পর্শের উচ্ছ্বসিত জোৎস্নায় নিয়ে এলো মেঘের ঘন ম্লানিমা! আত্মরক্ষা করতে সে উঠে দাঁড়ালো তারই বিরুদ্ধে যার স্পর্শে উত্তপ্ত গভীরতার জন্যে তার শরীরে ছিলো অবারিত অভ্যর্থনা! তারই বিরুদ্ধে সে গেলো মুক্তি খুঁজতে, যার বন্ধনে অবনমিত, উন্মথিত হবার জন্যে তার দেহময় ছিলো নীরব, সস্মিত সম্মতি। সুর্য্য ওঠবার আগে দিগন্তরেখায় যেমন অস্পষ্ট, পাণ্ডুর একটি আভার আভাস ফুটে ওঠে, তেমনি তার ঘুম ভাঙবার আগে রক্তে আধো-প্রচ্ছন্ন,. আধো-অপূর্ণ একটি অনুভবের ঢেউ জাগলো না কেন?

হয়তো এই অন্ধকারে ললিতার ঘুমন্ত দেহ মহীপতির কাছে রাত্রির তারকা-আকীর্ণ আকাশের চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মনে হয়েছিলো। বিছানায় সম্পূর্ণ-সমর্পিত, ঘনপর্ণকায়া বিসর্পিণী লতার মতো তার বিহ্বল দেহে সে এক নিমেষের জন্য হয়তো খুঁজে পেয়েছিলো অনেক বড়ো জীবন্ত সত্য—তার আকুল-এলায়িত চুলের অরণ্যে, ক্লিষ্ট প্রতীক্ষা-পরিপাণ্ডু কোমল মুখশ্রীতে, তার শোবার নিঃসঙ্গ, দুর্বল, বিষণ্ণ ভঙ্গিমায়। নিজের জাগরণের রূঢ় আঘাতে কেন সে স্বামীর চোখের স্বপ্নময় মুহূর্ত-মত্ততা এত

তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দিলো। এত রাজ্যের ঘুম তার আজ গেলো কোথায় ?

স্পর্শহীনতার সেই গভীর নিস্তব্ধতা অন্ধকারে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে।

মহীপতি আলো জ্বাললে, তার ক্ষীণ অনতিস্পষ্টতায় তার মুখের তেজস্বিতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে-মুখে যেন স্নেহালস একটিও ভঙ্গুর রেখা নেই। নিরাভ, নিশ্চল। গভীর নিখাদের একটা সুর যেন মাংসল প্রতিচ্ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র।

মহীপতি এক পা কাছে এগিয়ে এলো; গম্ভীর গলায় সরাসরি বললে,—চলো, আমার সঙ্গে এক্ষুনি তোমাকে যেতে হবে।

বিস্ময়াবিষ্ট, ব্যথিত চোখে ললিতা স্বামীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

মহীপতি চঞ্চল হয়ে বললে—বেশি দেরি করবার আমাদের সময় নেই। রাত থাকতেই বেরুনো চাই, ঘাটে নৌকো আমি ঠিক করে এসেছি। চলো। এক্ষুনি।

ধরা গলায় ললিতা জিগগেস করলে ঃ কোথায় ?

—যেখানেই হোক। আমার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমার ভয় কী!

ললিতা পা ঝুলিয়ে খাটের ধারে এসে বসলো। ঘুমে চোখ তার তখনো ঝাপসা, রাতের নিস্তরঙ্গ নদীর জলের মতো একটি অনুচ্চারিত বেদনা তাতে টলটল করছে। ঝাপসা কুণ্ঠিত গলায় সে বললে,—কিন্তু কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে ?

অন্ধকারে অন্তরঙ্গতায় গভীর একটি সুর বেজে উঠেছিলো হয়তো। কিন্তু মহীপতি কোমলতার ধার দিয়ে ঘেঁসলো না, খাটের বাজুটা ধরে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা দৃপ্ত, উদ্দীপ্ত করে সে বললে—সে অনেক দূরের, অনেক দুর্গম পথ। এই তুচ্ছ আরাম ছেড়ে কঠিন তপস্যার পথে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। চলো।

চমৎকার হয়েছিলো আবহাওয়া; রাত নিশুতি অন্ধকার, ঘাটে

নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু ললিতা কার সঙ্গে যাবে? মহীপতি ভগবদ্গীতার একটা নিষ্ঠুর শ্লোক আওড়ে সমস্ত আবহাওয়া দিলো উড়িয়ে। নইলে স্পর্শের সুখাবেশে ললিতার শরীরে এসেছিলো নতুন লাস্য, মনের মেঘলা রাত কেটে জেগেছিলো নতুন ভোরের আলো। প্রথম ভেবেছিলো আজ বুঝি তার কৌমারকোরক থেকে নারীর নবতন উন্মীলন-উৎসব; স্বামীর স্পর্শে আজ সেই অনুকূল দক্ষিণ বাতাসের সূচনা। তারপর ঘাটে নৌকো যখন তৈরি, তখন স্বামীর সঙ্গে নিশ্চয়ই সে বাপের বাড়ি চলেছে—ভোরের বেলায় স্টিমার ধরতে। ভাবতে তার শরীরে জেগেছিলো নদীর জলের মৃদুল চঞ্চলতা। ভোর রাতে, একা নৌকোতে ছইয়ের বাইরে সে আর তার স্বামী, জলের উপর তারার আলো চিকচিক করছে। তারা-ভরা আকাশের নিচে রাশি-রাশি জলের উপর তার আর স্বামীর মাঝে মধুর নিঃশব্দতা। কতো যে তার ভালো লাগতো কোনো কথা না বলে খালি জলের উপর বৈঠার ছপ ছপ আওয়াজ শুনতে, স্বামীর হাঁটুর একপাশে ম্লান একফালি জ্যোৎস্নার মতো ঘুমে এলিয়ে পড়তে। মহীপতির এক কথায় সমস্ত স্বপ্ন গেলো ধূলিসাৎ হয়ে। তপস্যা! এমন ঘুম-ভাঙা, ঠাণ্ডা মিষ্টি রাতে আবার ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কী বড়ো তপস্যা থাকতে পারে ললিতার? কোথায় অনেক দূর, কোথায় কী দুরধিগম্য, মহীপতি একেবারে তার হাতের কাছে, হাত একবার বাড়িয়ে দিতে পারলেই সে তার। তার জন্যে, এই পরিচ্ছন্ন গৃহকোণ, এই আরাম-রমণীয় উপাধান ছেড়ে পৃথিবীতে যাবার আর জায়গা কোথায়!

ভয়ে-ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে, ললিতা বললে,—কিন্তু তোমার সঙ্গে অতো দূর আমি যেতে পারবো কেন?

কথাটা মহীপতির কানে মধুবর্ষণ করলে না। রুক্ষকণ্ঠে বললে, —কেনই বা পারবো না? তুমি তো আমার স্ত্রী—অনুগামিনী। আমার যা ধর্ম, তোমারো তাই।

কথার ছটায় ললিতার দুই চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। কী যে সে বলবে গুছিয়ে চট করে কিছু ভেবে নিতে পারলো না; ক্লান্ত, কাতর গলা দিয়ে শুধু বেরিয়ে এলো: কিন্তু এই রাত করে যাবার কী হয়েছে?

—না, দিনের আলোয় সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়েও তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারি। মহীপতি কথাটাকে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টায় দু' পা হাঁটতে লাগলো: আইন। আমাকে আইনের চোখ-রাঙানি। তোমাকে নিয়ে যাবো, কে আমার পথ আটকায়! কিন্তু মিছিমিছি হাঙ্গামা করে লাভ নেই। এখন—এই রাত করেই তোমাকে নিয়ে পালাবো, ওঠো, দেরি কোরো না।

তবু যেন স্বামীর প্রতি ললিতার পরিপূর্ণ বিশ্বাস নেই। মহীপতি যেন কোনো অপরিচিত পরপুরুষ, তাকে চুরি করে পালাতে চায়। সন্দিগ্ধ, সঙ্কুচিত গলায় সে বললে,—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবো সে-কথা তো কিছুই বললে না।

—সে-কথা জেনে তোমার বিশেষ লাভও নেই। আমি স্বামী, আমার সঙ্গে যাবে—তাই যথেষ্ট। মহীপতি ঘুরে আবার ললিতার কাছে এসে দাঁড়ালো: তোমাকে এই বাড়িতে আমি আর একদণ্ডও রাখতে চাই না। বাবার কাছ থেকে আজ আমাকে কঠিন অপমান নিতে হয়েছে। না, তুমি চলো। আমার পথই তোমার পথ। তোমাকে আমি সেই ধর্মের পথেই নিয়ে যেতে এসেছি।

ললিতা আবার গেলো মিইয়ে; নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—তার চেয়ে আমাকে বরং বাপের বাড়ি রেখে এসো।

—তা পরে দেখা যাবে। তুমি আগে চলো তো। হ্যাঁ, এই এক কাপড়েই। ধর্মের পথ রিক্ততার পথ। তাতে কোনো উপকরণের দরকার নেই। এসো।

মহীপতি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

কিন্তু পিছনে, আঁচলে-চুলে ললিতার একবিন্দু চাঞ্চল্য নেই।

দেয়ালে খোদাই-করা নিরেট মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে সে বসে আছে। দুই চোখে তার ঘুমের ঘনিমা, তার ভিতর থেকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার দ্বিধা, তার সন্দেহ। এমন একটা আবিষ্ট দৃষ্টি, মহীপতিকে যেন সে চেনে না, সে তার কে যে তাকে সে দূর-দুর্গম পথে নিয়ে যাবার স্পর্ধা দেখায়! কি বিশ্বাস তাকে, সে দেবে আশ্রয়, উত্তাপ, সান্নিধ্য-স্বপ্ন? কী সে পটভূমি রচনা করেছে, যার উপরে তার সে এমন একটা কোমল আলেখ্য আঁকতে পারে?

সেই সন্ধিৎসু অথচ নিষ্প্রাণ চোখের কাছে মহীপতির নিজেকে কেমন অসহায় লাগতে লাগলো। দরজার কাছ থেকে সে ঘুরে এলো; কি বলছে ঠিক বুঝতে না পেরে সে বললে,—আমাকে যদি তুমি ভালোবাসো, স্বামী বলে আমার ওপর যদি তোমার কোনো ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে তো আমার সঙ্গে চলে এসো এক্ষুনি। তোমার কিছু ভয় নেই। আমি সব দিক থেকে তোমার ভালোই চাই শুধু।

এতটা মহীপতি বাড়াবাড়ি না করলেও পারতো—ললিতার ঠোঁটের বঙ্কিমায় ফুটে উঠলো তেমনি একটি হাসির শাণিত রেখা। দু'হাতের পিঠ দিয়ে চোখ কচলে সে বললে,—কিন্তু আমার যে বেজায় ঘুম পাচ্ছে।

কথাটা বলে ফেলেই ললিতার মন যেন আরো কত-কি বলবার জন্যে শতমুখে উন্মুখ হয়ে উঠলো। অগোছাল বিছানাটা ক্ষিপ্র হাতে পাট করতে-করতে ললিতা বললে,—রাত আর বেশি নেই, আমরা এটুকু সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই এসো। কাল ভোরেই না-হয় যাওয়া যাবে—সবায়ের সমুখ দিয়ে পাশাপাশি আমাদের বেরিয়ে যেতে তো কোনো লজ্জা নেই। চুপি-চুপি পালিয়ে যেতে হবে কেন? এসো, ঘুমে চোখ আমার ভেঙে পড়ছে একেবারে। কাল—কী বলো, কালই যাওয়া যাবেখন।

মহীপতির শরীরে যেন স্পন্দন নেই।

প্রশস্ত খাটের একটি ধার ঘেঁসে ললিতা শুয়ে পড়লো। স্বামীর জন্যে ছেড়ে দিয়েছে সে অনেকটা জায়গা, অনেক বিরহ। দেখি আর কেমন তার ঘুম আসে, আর কেমন বা সে জাগরণে প্রখর হয়ে ওঠে! আধো-ঘুম আধো-জাগরণের প্রচ্ছন্ন প্রদোষচ্ছায়ায় সে নিজেকে রাখবে আচ্ছন্ন করে। রাতের বাকি সময়টুকু সে ঘুমুবেও না চোখও মেলবে না।

ঘরময় আবার স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে স্থিতিমান নিস্তব্ধতা।

ললিতা সেই স্তব্ধতায় যেন খানিকটা সাহসিকা হয়ে উঠেছে: আলোটা নিভিয়ে দাও, শুতে এসো।

মহীপতি নির্লিপ্তের মতো বললে,—তুমি ঘুমোও, আমি বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটু বসি।

॥ ছয় ॥

ঘুম যখন ভাঙলো, দেয়ালের ল্যাম্প তখনো মিটমিট করে জ্বলছে। বারান্দার দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরে মহীপতি নেই। আকাশের কবোষ্ণ-কোমল আলো অজস্র উৎসারে তার চোখে-মুখে ছিটিয়ে পড়েছে—তার বিছানার উপর, তার শাড়ির কুঞ্চিত রেখায়, তার কালো চুলের মর্মরিত অরণ্যে। এতো আলো যেন মহীপতির সেই অতর্কিত, উচ্ছ্বসিত স্পর্শের মতো তার গায়ের উপর ঢেলে দিয়েছে।

সারা দিনের মধ্যে মহীপতির আর দেখা নেই। প্রথমটা ললিতা চোখে ঝাপসা দেখলে, এবং দিন পেরিয়ে রাতের অন্ধকার যখন অকূল হয়ে উঠলো, তখন একা ঘরে তার দুঃখের আর শেষ রইলো না। তার জীবনে এসেছে যেন আকাশহীন অন্ধকার দিন, মৃত্তিকার আশ্রয়হীন নিরবচ্ছিন্ন রাত। পরিবারের আর-সবাই বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, তাদের কাছে মহীপতির এমনিতরো অসাময়িক অন্তর্ধানে কোনো আকস্মিকতা নেই। কিন্তু ললিতা জেগে-জেগে দুঃসহ দুঃস্বপ্ন দেখছে, কেবলি মনে হচ্ছে—আর তিনি ফিরছেন না। ফিরে এলেই বা তার কী, যে-তিমিরে সে সেই তিমিরে—সেই কঠিন প্রস্তরীভূত স্পর্শহীনতা নিরাবরণ নিদারুণ উপেক্ষা—তবু, আজকের তার এই অসহ্য নির্জনতায় মাত্র তার কায়িক উপস্থিতির চেয়ে বড়ো নির্ভর সে কল্পনা করতে পারছে না। একা সে নিশ্চয়ই, কিন্তু কতোখানি একা, আজ তা মনে-মনে পরিমাপ করতে গিয়ে ললিতা হাঁপিয়ে উঠলো।

কিন্তু এতই যদি তার একা লাগবার কথা, তবে সে স্বামীর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়লো না কেন? সত্যি,

সংস্কারে-শিক্ষায় স্বামীর কথায় ওঠ-বোস করবার জন্যেই তো সে তৈরি হয়ে এসেছে—তার রক্তের আনুক্রমিক ধারায় তো ছিলো সেই বশ্যতা। কেন সে গেলো পেছিয়ে, কেন সে নিতে পারলো না এই সাহচর্য? কিন্তু কেনই বা সে যেতো—কার সঙ্গে? স্বামী হবার আগে মহীপতি কেন হলো না পুরুষ? 'আমাকে যদি ভালোবাসো, তবে এসো আমার সঙ্গে চলে।' তাকে ভালোবাসবার সুযোগ সে তাকে দিলো কোথায়? আধিপত্যের কথাই সে বড়ো করে দেখালো, অধিকারের নয়। নইলে যদি মহীপতি তার শরীর-মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারতো প্রেমের প্রফুল্লতা, আনতে পারতো তার বাহুর কাছে বলিষ্ঠ বুক, তাকে ঘিরে সৃষ্টি করতে পারতো স্বপ্নের ঊর্ণা—ললিতা কখনো এক পা পিছিয়ে থাকতো না, যেতো তার স্বামীর সঙ্গে, হোক যতো দূরের পথ, যতো দৈন্য-দুর্গতির। 'যদি আমাকে ভালো-বাসো—' তবু ললিতার মুখে ফুটলো না তৃপ্তি, দেহে জাগলো না তরঙ্গ। আর স্বামী তাকে ভালোবাসে বলেই দিয়ে গেলো তাকে এই অমিত অন্ধকার, এই আধ্যাত্মিক অনিদ্রা।

ললিতার কাছে বিচ্ছেদের ভার যেন দিনে-দিনে দুর্বহতরো হয়ে উঠছে। স্বামীর সঙ্গে যদি-বা সে যেতে পারলো না, তাকে আটকে রেখে দিতে পারলো না কেন? কেন গেলো না নিজের জোর খাটাতে, প্রয়োগ করতে তার আক্রমণের অস্ত্র? বন্য, হিংস্র জন্তুর যেমন শৃঙ্গ আর নখর, তেমনি তার ছিলো রূপ আর লাবণ্য। সেই বা কেন পাথরের মূর্তিতে সঞ্চারিত করতে পারলো না প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের অপরূপ ইন্দ্রজাল! তারই তো স্বামী, সে জোর করে তাকে প্রেমে প্রগল্‌ভ, লোভে আবিল, কামনায় উদ্বেল করে তুলতে পারলো না কেন? যেমন করে হোক, তাকেই তো ধরে রাখা উচিত ছিলো। এতোদিন এই নিরর্থক প্রতীক্ষার পর, তার ফিরে আসার মুহূর্ত গুনে ললিতাকে আরো, আবার প্রতীক্ষা করতে হবে নাকি? আর মহীপতি কেনই বা ফিরে আসবে—কার কাছে? ললিতা যদি তার আকাশে বিহ্বল,

পরিপূর্ণ চন্দ্রোদয় হতো তো নিশ্চয়ই জোয়ার জাগতো তার জীবনে ; কিন্তু ললিতা তার জীবনের জানলায় মাটির বাতির কুণ্ঠিত শিখাটির মতোও ফেলতে পারলো না এক ফোঁটা দৃষ্টি, রইলো সে নির্জীব, নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে। দিতে পারলো না সে নিজেকে উচ্চারণ, আনতে পারলো না তার যৌবনের সুষমার উপর নারীত্বের আভা। কেনই বা সে ফিরে আসবে—ললিতার মাঝে তার কিসের আকর্ষণ! সে নির্বাককুণ্ঠা বধূটি হয়ে রইলো, হতে পারলো না সে বিজয়িণী রমণী। তাকে দিয়ে মহীপতির কী হবে, কিসের তার মূল্য! মহীপতি তার দেহে চাইলো পূজামন্দিরের নির্মল, শীতল পরিচ্ছন্নতা, সেখানে প্রচ্ছন্ন রইলো কিনা মদিরার ফেনপ্রাচুর্য, অথচ সেই তপ্ত স্বাদ সে পরিবেশন করতে পারলো না স্বামীর অধরে! আর আজ কিনা তার তিরোধানের পর ললিতা বিষাদ-স্তিমিত, নিরাভ, ম্লান দেহে তার পরিত্যক্ত, বিদায়ব্যথা-পুঞ্জিত নির্জন পূজার ঘরটিতে এসে বসেছে।

কেন যে মহীপতি তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কথাটা ললিতার কানে উঠতে দেরি হলো না। তারি, শুধু তারি জন্যে। তারি জন্যেই তো নিতে হয়েছে তাকে দূর-দুর্গম পথ, সে-পথেও তার কথা মহীপতি ভোলে নি, দিতে চেয়েছিলো তবুও তাকে সে তারই পাশে স্থান, তারই পাশে প্রতিষ্ঠা। শুধু ললিতাই ছিলো না প্রস্তুত, তাই বলে মহীপতি তার উপর এমন প্রতিশোধ নিলে? সে তো জানতো ললিতা তারই প্রতীক্ষায় অস্তিত্ববোধে অচেতন হয়ে আছে ; তাকে যদি সে নিতেই এলো, তবে প্রবল দস্যুর মতো তাকে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো না কেন? ললিতার কাছে তার ভিক্ষা করবার কী আছে, সে তো পরাক্রান্ত প্রভু—কিসের তবে তার সঙ্কোচ!

ললিতা পূজার ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকে—তার শরীরে নেমেছে বিষাদের ধূসর গোধূলি। সেও স্বামীর উপর চমৎকার প্রতিশোধ নিয়েছে যা হোক—তার এতদিনের এই বিরাট ঔদাসীন্যের।

আর সেই প্রতিশোধের প্রতিফল এই নির্জনতার বোঝা। ললিতা বসে-বসে স্বামীর এই অনুপস্থিতির মাঝে তার নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ধ্যান করে; ভাবে, ব্যবধানের হ্রস্বতাই তো আর অন্তরঙ্গতার আদর্শ নিদর্শন নয়। শারীরিক সান্নিধ্যের বদলে এই আধ্যাত্মিক দূরত্বে মহীপতিকে আরো সে একান্ত আপনার, একান্ত একলার করে পেতে চাইলো।

আশা ছিলো—মহীপতি শিগগিরই একদিন ফিরে আসবে, তার এই স্বামিধ্যান ব্যর্থ হবে না। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর, ক্ষীয়মান চাঁদের মতো ললিতা বিবর্ণতরো হতে থাকে, মহীপতির দেখা নাই। প্রত্যাবর্তনহীন, অপরিবর্তনীয় পথে সে এগিয়ে চলেছে। বসে-বসে সেই পথের পার খোঁজে, খোঁজে তার প্রতীক্ষার পূর্ণতা। সময়মতো নায় না, সময়মতো খায় না, সংসারের কাজে-কর্মে তার উৎসাহ নেই; শুধু মহীপতির পূজার এই নির্জন ঘরটিতেই তার বিশ্রাম। সমস্ত সংসার যেন তার কাছে অপরাধী, কেউ কিছু তাকে শাসন বা অনুযোগ করতে ভয় পায়, স্নেহ বা সহানুভূতি দেখাতে লজ্জিত হয়। সংসারের আকাশে ঘুলিয়ে উঠেছে ঘন নিঃশব্দতার মেঘ, অসহায় বেদনার ক্লান্তি।

তবু, দিনের পর দিন যায়, বেদনার চেয়ে ললিতার অপমানই যেন বেশি লাগতে থাকে। ক্রমে-ক্রমে তার প্রতীক্ষার আয়ুষ্কাল এলো ফুরিয়ে, এই ক্লান্তিকর নির্বাসনের গ্লানি তাকে পীড়িত করে তুললো। তার কুণ্ডলীকৃত, জড়ীভূত জীবন হঠাৎ ফণা বিস্তার করে উঠলো, অপমান নয় তো কী? স্বামীর সংসারে এসেছিলো সে লাল চেলি পরে, তাতে ছিলো বক্তিমার বন্যা, অনুরাগের রক্তিমা—এই ঔদাস্য-ধূসর গেরুয়ার তাতে ছাপ ছিলো না। এসেছিলো সে প্রেমে পরিপ্লুত হতে, বাসনায় সোনা হয়ে উঠতে। চেয়েছিলো সে আকাশ-আকীর্ণ তারকা-মালার মতো প্রতি রক্তবিন্দুতে রোমাঞ্চিত হতে, ধরিত্রীর মতো শস্যশালিনী হতে, তার দেবতা ছিলো স্বামী, মন্দির ছিলো এই

দেহ, অর্ঘ্য ছিলো তার যৌবন। সারা জীবন বসে-বসে সে এই নিষ্ফল প্রতীক্ষা করবে নাকি? পৃথিবীতে আর তার কোনো কাজ নেই, বন্ধ্যা মরুভূমিতেই কি তার আমরণ পদচারণা করতে হবে? প্রতীক্ষা করবার ঐ এক বস্তুর প্রতিই কি তার জন্ম-তারকা অহর্নিশ সঙ্কেত করে আছে? তার স্বামীরই আছে পথ, আর তার এই পিঞ্জরের দেয়ালে অনবরত মাথা ঠুকে মরা।

আরো কিছুদিন দেরি করে ধরণীবাবু ললিতাকে নিতে চলে এলেন।

কেউ আর আপত্তি করবার ভাষা খুঁজে পেলো না। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে কারুর মৃত্যু যেমন কাম্য হয়ে ওঠে, তার তিরোধানে যেমন সকলের মুখের উপর নামে শোকাকুল নীরব স্বস্তির ভাব, তেমনি ললিতার-যাবার মুহূর্তে শ্বশুর-শাশুড়ি, জা-ননদ, সবাইর মুখে এসেছে বেদনায় করুণ একটি স্তব্ধ মন্থরতা। এদের ছেড়ে যেতে ললিতার শরীরটা ছিঁড়ে পড়ছে, কিন্তু একজনের সঙ্গে-সঙ্গে তাকেও বোধকরি এদের সবাইকে ছেড়ে যেতে হলো।

এতোদিন যা ছিলো মাত্র আত্মার অকূল নির্জনতা, বাবার সঙ্গে নৌকোয় চড়ে ললিতার মনে হলো এ যেন তার অবারিত অজস্র মুক্তি। নদীর জলের সঙ্গে-সঙ্গে তার জীবনও যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। পথ কেবল একলা মহীপতির সামনেই পড়ে নেই—তারো সামনে আছে অনাবিষ্কৃত আকাশ, অপস্রিয়মাণ অনন্ত দিগন্তরেখা।

তারপর স্টিমার ছেড়ে ললিতা ট্রেনে চাপলো। ঘূর্ণ্যমান চাকায় বেজে চলেছে গতির উদ্দামতা; চলেছে সে কলকাতায়—জনাকীর্ণ বিপুল রাজধানীতে। হঠাৎ ললিতা নিজের মাঝে খুঁজে পেলো যেন অনেক বিস্তার, অনেক ভবিষ্যৎ। তার সঙ্কীর্ণ, স্নিগ্ধ আকাশ আজ যেন কতো বৃহৎ, কতো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ললিতা তাতে খুঁজে পাচ্ছে যেন আপন ছন্দ, আপন অনুপাত। নির্মোক খসিয়ে জেগে

উঠেছে যেন সে জীবনের উলঙ্গ তীব্রতার মধ্যে, কয়েদির বেড়ির থেকে ছাড়া পেয়ে পায়ে পেয়েছে যেন সে চলবার পথ, পথের স্বাধীনতা। কিসের তার দুঃখ, কিসের তার প্রতীক্ষা!

শেয়ালদা-স্টেশনে গাড়ি যখন দাঁড়ালো, তখন ভোর হয়ে গেছে।

—ঐ যে, ঐ যে দিদি!

ছুটতে-ছুটতে কামরার কাছে নটু এসে হাজির।

—তুই এত ভোরে কি করে এলি, নটু? দরজা খুলে নামতে-নামতে ললিতা জিগগেস করলে।

—বা, একলা আসতে যাবো কেন? মাস্টারমশাইও এসেছেন সঙ্গে। গাড়ি করবে না একটা?

ললিতা তার আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানি কোলের কাছে চেপে ধরলো; বললে,—তোর আবার মাস্টারমশাই হয়েছে—এত বড়ো দিগগজ হয়ে উঠেছিস, এ-কথা কই আমাকে আগে লিখিস নি তো?

একটি প্রিয়দর্শন যুবক কাছে এসে মুখে কুণ্ঠিত একটি পরিচয়ের আভাস এনে নমস্কার করলো।

নমস্কারটা যে কাব উদ্দেশে তাই নির্ণয় করতে ললিতা ধরণীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছে, ধরণীবাবু বললেন,—ও আমাদের সৌরাংশু, নটুর গার্ডিয়ান-টিউটার। একটা এবার গাড়ি জোগাড় করো দিকিনি।

এক পা দু পা করে সৌরাংশু সরে যেতেই ধরণীবাবু বললেন,—চমৎকার ছেলে। লেখা পড়ায় যেমন ভালো, তেমনি অমায়িক, খাসা ছেলে। ওর বাবা আর আমি বন্ধু, এক মেসএর রুম-মেট ছিলাম।

সৌরাংশুর গাড়ি ডাকতে যাওয়া বৃথা, নটুই এক কোচোয়ান ধরে এনেছে।

—বাদুড়বাগান—এক টাকায় ঠিক করে আনলাম, বাবা। না,

না, এর ওপর আবার বকশিস্ কী। দিদি, এই মোটে তোমার জিনিস? নটু বাহাদুরি করে কুলির মাথায় মাল তুলতে গেলো, আমার জন্যে কী এনেছ বলো দিকিন্? অন্তত এক হাঁড়ি ক্ষীর? তা-ও নয়? তোমার শ্বশুরবাড়িটা বুঝি তেমন সুবিধের নয়, না? বলে সে অনর্গল হেসে উঠলো।

গাড়িতে উঠে ধরণীবাবু বললেন—তুমি কোচবাক্সে উঠতে যাচ্ছ কী, সৌরাংশু, ভেতরে এসো।

সৌরাংশু কুণ্ঠিত হয়ে গাড়ির উলটো দিককার সিটে নটুর পাশে এসে বসলো।

॥ সাত ॥

কলকাতায় এসে ললিতা দেখলে তার মন প্রজাপতির পাখার মতো হাল্‌কা হয়ে গেছে, তার শরীরে এসেছে স্রোতের চঞ্চলতা। নোঙর ছেড়ে নৌকো যেন উদ্দাম হাওয়ায় তুলে দিয়েছে পাল। আর সে মানতে চাইলো না কোনো বন্ধন, নিজের অতিরিক্ত কোনো তার বৃহত্তরো পরিচয়। জানলা দিয়ে যদি বা সে কখনো বাইরের দিকে উদাসীন চোখে তাকায়, তা কারো কোনো প্রতীক্ষার আশায় নয়, বাইরের গতি-উদ্বেল বিপুল জনসঙ্ঘের থেকে সমস্ত রক্তধারায় সংক্রামিত করে নিতে যাত্রার অনুপ্রাণনা।

ধরণীবাবু বললেন,—কী বলো সৌরাংশু, ম্যাট্রিকটা ললিতা বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবে, ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে গেলে মিছিমিছি কতোগুলি বছর মাটি।

মাস্টার বলতে সাধারণতো মনে যেই শ্রেণীবোধ জাগে, সৌরাংশু তার থেকে বিচ্ছিন্ন, তাকে নিচের তলায় কোণের একটা ঘরে রুটিনের শিকলে বেঁধে কয়েদ করে রাখা হয় নি। সৌরাংশুর বাবা সুরপতির সঙ্গে ধরণীবাবু বন্ধুতাটা সেই পর্যায়ে উঠে এসেছিলো যার ধারাটা এক সমতল স্তরেই কতোদূর প্রবাহিত হয়ে শুকিয়ে যায় না, তাতে ছিলো বহুদূরপ্রসারী দুর্বারতা। তাই সুরপতির অকালে হঠাৎ মৃত্যু ঘটলেই ধরণীবাবু স্মৃতির সুতোতে তক্ষুনি আলগা দেন নি, খোঁজ করেছিলেন সৌবাংশুর, বাপের আকস্মিক মৃত্যুতে যে এখন পড়েছে এসে অনাত্মীয় আবহাওয়ায়। তাকে স্থান দিলেন তাঁর বাড়িতে, এবং পাছে তাতে কোনো করুণার গন্ধ থাকে, তাকে বসালেন এনে নটুর মাস্টারিতে। বাজার-দরের সঙ্গে মিলিয়ে তার একটা মাইনে ধার্য করে দিলেন, এবং যাতে সংখ্যাটা একটু ভদ্রতায় স্ফীত হতে

পারে, তাকে করে দিলেন নটুর অভিভাবক। তাই বলে সামান্ত মাস্টারের বেলায় যেমন, তিনি সৌরাংশুর চারপাশে সঙ্কোচ বা অপরিচয়ের দেয়াল উঠতে দিলেন না। যেমন তাকে দিলেন স্থান, তেমনি পরিসর, যেমন তাকে করলেন নিভৃত, তেমনি আবার অবারিত। কোনোদিন যদি সে বাজারেও যায় সংসারের সওদা করতে, নটুর মাস্টার-হিসেবে সে যায় না, সে তাঁর সুরপতির ছেলে। কোথাও তার পায়ের তলায় এতটুকু তিনি একটা প্রচ্ছন্ন কাঁটা রাখেন নি, আর সৌরাংশুও এমন উদাসীন, এত বন্ধনেও এমন নির্লিপ্ত যে, তার নির্বাধ পায়ের তলায় সমস্ত সংসার সে সুকোমল করে রেখেছে। ললিতার আবির্ভাবেও দরজায়-দরজায় পরদা পড়েনি, তার চারপাশের দেয়াল আসে নি ছোট হয়ে, উপরে ওঠবার সিঁড়িটা স্বর্গে উঠে যায় নি একলাফে। তার চরিত্রে এমন একটি নির্মল দীপ্তি ও দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য ছিলো যে রৌদ্রোদয়ের মতো শত চোখ বুজেও তুমি তা অস্বীকার করতে পারো না। রৌদ্রের সেই রূঢ় অবশ্যম্ভাবিতার মতো সমস্ত সংসারে তার বলিষ্ঠ উপস্থিতি রয়েছে ছড়িয়ে।

তার কাছে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে বলে সৌরাংশু একটু লজ্জিত হলো; গলা এলো নেমে: হ্যাঁ, চেষ্টা করলে দু বছরেই উনি অনায়াসে পাশ করে যেতে পারবেন—হয়তো দু বছরও লাগবে না। আমি সেদিন দেখছিলাম ওঁর ইংরিজি লেখা—

—কী মনে করো, ধরণীবাবু তাকে তাঁর নিভৃত অন্তরঙ্গতায় আহ্বান করলেন: ওর পড়াশুনোর কী রকম ব্যবস্থা করলে ভাল হয়?

—তার তো খুব সহজ ব্যবস্থাই আছে। ললিতা এককোণে দাঁড়িয়ে ধরণীবাবুর টেবিলটা গুছিয়ে দিচ্ছিলো, চোখ তুলে বললে—সোজাসুজি এক মাস্টার রেখে দিলেই হয়। তাই বলে, এইবার ললিতা সৌরাংশুর লজ্জমান মুখের উপর এক ঝলক হাসি ছুঁড়ে

মায়লো : তাই বলে নটুর মাস্টার-মশাইকে নয়, বাবা, নটু তা হলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

ধরণীবাবু স্মিতমুখে বললেন,—না, নটুর ভাগে হাত দিতে যাওয়া ঠিক হবে না। তারপর সৌরাংশুর দিকে চেয়ে : তুমি ললিতার জন্যে কোনো মেয়ে-মাস্টার ঠিক করে দিতে পারো?

—পারি।

—কোত্থেকে? তোমার জানাশোনা কেউ?

—হ্যাঁ, সৌরাংশু যেন কথা বলতে গিয়ে ঈষৎ অনুরণিত হয়ে উঠলো : আমাদেরই গ্রামের একটি চেনা মেয়ে আছে। গত বছর বি-এ পাশ করেছে ডিস্‌টিঙ্কশানে,—যদি বলেন তো তাকে বলতে পারি। তাদের অবস্থা খুব খারাপ, বাপ-মায়ের এ-ই বড়ো মেয়ে, নাম সুমনা,—সে-ই রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে। লীলাবতী হাই-স্কুলে টিচারি করে, এমনি-ধারা একটা টিউশানি পেলে তার ভালোই হয়।

ধরণীবাবু ঢোঁক গিলে বললেন—কিন্তু আমরা কি তাঁকে বেশি মর্যাদা দিতে পারবো?

—টাকার কথা বল্‌ছেন তো? সাধারণ যা রেট, তাই দেবেন, পঁচিশ টাকাই যথেষ্ট। সৌরাংশু কথা বলতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের উপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে বসলো : তা, আমি যদি বলি, আরো কিছু সে ছাড়তে পারে।

—সর্বনাশ! ললিতা স্নিগ্ধ হাসিতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : টাকা ছাড়তে গিয়ে শেষকালে তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকুন। বিনা-ভিজিটে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে রুগীই অক্কা পাক আর-কি।

—না, ধরণীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : টেনে-বুনে পঁচিশ টাকা আমি দিতে পারবো, তুমি তাঁকে খবর দাও।

সৌরাংশুও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিলো, ললিতার

কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দিলো: শুনুন। আপনার 'নমিনি' বলে তো গোড়ায় তাঁকে কাজ দিচ্ছি, শেষকালে বিশেষ সুবিধের না বুঝলে কিন্তু তাঁকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বিদেয় হতে হবে।

সৌরাংশু হেসে জিজ্ঞেস করলে: সুবিধের কি অসুবিধের এটা কে বিচার করবে?

—বা, আপনি তবে আছেন কী করতে শুনি? সে তো মোটে বি-এ পাশ, আর আপনি একটা জলজ্যান্ত এম-এ, আপনি দেখবেন না সে ঠিকমতো আমাকে পড়াচ্ছে কি না?

তরল, অকুণ্ঠ গলায় সৌরাংশু বললে—আমার তবে সেই এক্সট্রা খাটুনির জন্যে কে মাইনে দেবে?

—বা, আপনার সেই মাস্টারি তো আর আমার ওপর নয়, আপনার 'নমিনি'-র ওপর। ললিতা হেসে উঠলো: মাইনে যদি কিছু দিতে হয়, সে দেবে। দায় তো তার, আমি তো তাকে সব সময়ে বিদায় দেবার জন্যেই প্রস্তুত থাকবো।

বাইরে থেকে ললিতা তার বিবাহিত জীবনের সমস্ত গ্লানিকর পরিচিতি নিঃশেষে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছে, মুছে ফেলেছে সে তার সিঁথির সিঁদুর, তার পরাজয়ের পঙ্কতিলক, গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে তার স্বামি-সহধর্মের বৈরাগ্যের শুষ্কতা, আত্মদহনের অঙ্গার-কালিমা—এখানে এসে এ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়িতে লেখে নি সে একখানাও চিঠি। যেন একটা শ্বাসরোধী দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা থেকে ছাড়া পেয়ে সে তার নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মধ্যে ফিরে এসেছে কই, কোথাও কিছু তার পরিবর্তন হয় নি। তেমনি সে তার বাড়িতে, যেখানে সমস্ত সংসার জুড়ে আগের মতোই মা'র তিরোধানের ছায়া, বাবার বিরহব্যাথাস্নিগ্ধ চিত্তের মধুরতা, নটুর চঞ্চল, অনর্গল দুষ্টামি। সমুদ্রে ডুবে গেছে স্বপ্ন দেখে ললিতা ছটফটিয়ে জেগে উঠলো—না, সে তো তেমনি তার বিছনায় শুয়েই ঘুমুচ্ছে। তেমনি তার শরীরের মসৃণ বৃন্তে আত্মার অনাঘ্রাত ফুল রয়েছে ফুটে। সে বিধবা নয় যে

শরীরে আনবে কৃচ্ছ্রসাধনার মলিন রুক্ষতা, বিচ্ছেদের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। সাজসজ্জায় প্রসাধনে-অঙ্গরাগে ললিতা একেবারে নিশীথনগরীর মতো ঝল্‌মল করছে। নেই তার আর এতটুকু কার্পণ্য, কিঞ্চিৎকর কুণ্ঠা। চুলের জটিল দীর্ঘতায় সে এখন এনেছে নিবিড় কৃষ্ণিমা, শাড়িতে এনেছে দৈহিক প্রাখর্য, তার সমগ্র দৃশ্যমানতায় বর্ণরাগের একটা রূঢ় প্রগল্‌ভতা। সে আর নয় বিবাহিতা যে পদে-পদে থাকবে অনুচ্চারিত, সংসারের ঘানিতে ঘুরে বেড়াবে অন্যের ইচ্ছার ভারবাহী হয়ে। ললিতা তার মাথার ঘোমটা ফেলেছে খসিয়ে, আঁচলটা বন্ধনের হ্রস্বতা ঘুচিয়ে এখন মুক্তিতে হয়েছে বিস্ফারিত। কপালে আর আঁকে না সে সিঁদুর, ললাটে এখন তার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। সে এখন আবার সেই ললিতা, সেই কুমারী ললিতা, শরীরে এখন যার দুর্বহ মন্থরতার বদলে উছলে পড়ছে লাস্য, হরিণচাঞ্চল্য। এখন সে আবার খিলখিল করে হাসে ; গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে ; দীপ্ত, দ্রুত পায়ে বাড়িময় বইয়ে দেয় সে গতির নির্ঝরিণী। তার পটভূমিতে এ-পর্যন্ত যতোগুলি রঙের আঁচড় পড়েছিলো, ধীরে-ধীরে সব মিলিয়ে গিয়ে এখন একরঙা হয়ে উঠেছে—তার এই অনাবৃত, অবারিত শুভ্রতা। এখন সে একেবারে একা, নিঃশেষে সে স্বাধীন, জীবনে এখন কেবল তার এই শাদা, শাণিত ঔজ্জ্বল্য। মাঝের ক'টা দিন সে একটা অন্ধকূপে বন্দী হয়ে ছিলো মাত্র।

বাইরে থেকে সমস্ত অতীতকে এমনি করে উড়িয়ে দিতে চাইলেও তার মনে—যে-মন চেতনার নিচের তলায় অন্ধকারে অনাবিষ্কৃত থাকে চিরকাল—সেই তার অবজ্ঞাত, প্রচ্ছন্ন মনে মহীপতির সংস্পর্শের তাপ ছিলো যেন সুষুপ্ত। সেটা ধরা পড়তো তার সৌরাংশুর সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারে, তার সঙ্গে অমায়িক কথা-বার্তায়। বাইরে থেকে অস্বীকার করলেও, মহীপতি তার স্মরণের অন্তরালে বসে ললিতার চরিত্রে এনে দিতো একটা দুর্জয় দৃঢ়তা, তার মেরুদণ্ডে আনতো একটা দুর্নমনীয় ভঙ্গি। তার নারীত্বের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিতো

অসহনীয় একটা দৃপ্ত মর্যাদাবোধ, তার নিজের অধিকারের একটা অসাধারণ মূল্য। ধারে-কাছে, ঘরে-বারান্দায়, সৌরাংশুর ছায়া পড়তেই ললিতার চেতনায় মহীপতির স্মৃতি উঠতো সজাগ হয়ে, তার স্বাতন্ত্র্যবোধে নিয়ে আসতো একটা দূরত্বের ভাব। মহীপতিকে ভুলতে চাইলেও ভোলা প্রায় অসম্ভব। পরাভবে যে সে নতি স্বীকার করবে না, তার ব্যক্তিত্বে আনবে যে সে একটা তেজের প্রখরতা—এই প্রতিজ্ঞার পেছনে যেন মহীপতিরই প্রেরণা রয়েছে প্রচ্ছন্ন। তাই সহজ সাংসারিক কথা-বার্তায় সৌরাংশুর সে সন্নিহিত হয়ে এলেও মহীপতি তাকে যেন প্রবলতম আকর্ষণে বহু দূবে সরিয়ে রেখেছে। মহীপতিকে উড়িয়ে দেবে তার সাধ্য কী!

তারপর, একদিন ললিতার মাস্টারনি এসে হাজির।

দীর্ঘাঙ্গী, শীর্ণ একটি মেয়ে—এই সুমনা, বয়েস কুড়ি-একুশের বেশি নয় নিশ্চয়, ছু'দিনেই ললিতার সঙ্গে তার গলায়-গলায় ভাব। বয়সের যা-বা কিছু একটা ব্যবধান ছিলো, সম্পর্কের যা-বা একটা গাম্ভীর্য—ছু'টি দিনের স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গতায় তা গেলো নিশ্চিহ্ন হয়ে। থেকে-থেকে তাদের সহাস্য কলকণ্ঠে ঘরের দেয়ালগুলো আজকাল উচ্চকিত হয়ে উঠছে।

সুমনা সেই জাতের মেয়ে নয়, যারা তাদের অস্তিত্বের সত্যটা মাত্র একটা উপস্থিতির তথ্যে পর্যবসিত করে এনেছে। নয় সেই জাতের মেয়ে, যারা তাদের শরীরের চারপাশেই গেছে ফুরিয়ে। গাছের যেমন শোভা তার মর্ম্মর-মুখর পত্র-সমারোহে নয়, তার বলীয়ান উদ্ধত স্তব্ধতায়, তেমনি সুমনা উচ্চারিত হয়ে উঠেছে তার শরীর-সম্ভারে নয়, আত্মার উদাত্ত উপলব্ধিতে। তরলায়িত ঝর্ণা নয়, মধ্যসমুদ্রের বিশাল নিস্তরঙ্গতা। শোভা ছিলো তার শক্তি, ত্বকের চাকচিক্য নয়, রক্তের ঔজ্জ্বল্য; সেই উজ্জ্বলতা ছিলো তার সমস্ত চরিত্রে; তার সমস্ত শরীরে ছিলো দৃপ্ত, নিষ্ঠুর কাঠিন্য। অন্তরের উপলব্ধিতে বাইরে সে সব সময়েই উদাস, সব সময়েই অশরীরী। পৃথিবীর দিকে তাকাতে

গিয়ে নিজের দিকে তাকাবার তার সময় হয় নি, আর এ তার ঘরের দেয়ালে ফোকর ফুটিয়ে ঝিকিমিকি আকাশ দেখা নয়, সে মুখ দেখছে তার আকাশের আয়নায়, অনির্বাণ আকাশের। তার দুই চোখে জ্বলছে যেন সেই আকাশের নিষ্ঠুর উলঙ্গতা।

সুমনা আধঘণ্টাটাক বই-খাতা নেড়ে-চেড়ে তৃপ্তমুখে বলে উঠলো: এমনি একটি ছাত্রী পাওয়া বহু জন্মের সৌভাগ্য, ললিতা। মিছিমিছি তুমি আমাকে মাস্টার রেখেছ, এই আসছে বছরেই তুমি ম্যাট্রিক দিতে পারবে, নিজের থেকেই তুমি তৈরি হয়েছ যথেষ্ট। সারা দিন-রাত যে বই নিয়ে পড়ে থাকে তার উন্নতি হবে না তো হবে কার? শুধু-শুধু আমি খাটছি।

অসহিষ্ণু হয়ে ললিতা জিগগেস করলো: তাই বলে আপনি এ-কাজ ছেড়ে দেবেন নাকি?

—পাগল। সুমনার মুখে বেদনার্ত একটা ভঙ্গির মতো অস্ফুট একটি হাসি ভেসে উঠলো: মাস-মাস পঁচিশটে করে টাকা, মায়া ছাড়ি কী করে বলো? আমার এখানে না-হয় দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে আমার টাকার দরকার তো আর কিছু কম হয় নি!

—ও আপনি বাড়িয়ে বলছেন সুমনা-দি। ললিতা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো: আমি পড়ার এখনো কিছু কূল-কিনারা করতে পারছি না, তবে ধাত এবার কতকটা বুঝে গেছি, মনে হচ্ছে।

—সেই তো আসল সিক্রেট। তেমনি কটা মেয়েই বা বোঝে? সুমনা তার নাকে-মুখে বিরক্তির একটা তীক্ষ্ণতা এনে বললে,—একেকটা মেয়ে যা আছে, একেবারে আকাট মূর্খ। হস্তীমূর্খ বললেও তাদের সম্মান করা হয়, বলা উচিত গণ্ডার-মূর্খ। কামান মেরে তবু গণ্ডারের চামড়া ভেদ করা যায় শুনেছি, কিন্তু শত-লক্ষ বোমা মেরেও এদের মাথায় তুমি একটা ফুটো করতে পারবে না। বলতে-বলতে নিজেই সে হেসে উঠলো: সেই সব ছাত্রীর ভিড়ে তোমার মতো একটি মেয়ে পাওয়া একটা আশীর্বাদ। তোমার কাছে আসি, যেন

সারা দিনের রৌদ্রের পর ছায়ায় বিশ্রাম করতে আসি। এত ঠাণ্ডা, এত মিষ্টি লাগে!

কথার সুরে হঠাৎ এমন একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া তৈরি হলো যে কথার মোড় গেলো ঘুরে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সুমনার ক্লান্তিক্লিন্ন রুক্ষতা ললিতার কাছে ভারি করুণ মনে হলো। সামান্য একটু দ্বিধা করে ললিতা জিগগেস করলে: আপনাকে একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না?

—বা রে, কী আবার মনে করবো?

—আপনার এই কাজ করতে ভালো লাগে?

—ভীষণ ভালো লাগে। সুমনা উৎসাহে যেন সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো: নিজে খেটে নিজের রুটি সংগ্রহ করতে পারছি, এর চেয়ে বড়ো সুখ আর তুমি কী কল্পনা করতে পারো? এর চেয়ে বেশি দাম আর কার কী থাকতে পারে?

ললিতা বললে,—কিন্তু মেয়েদের পক্ষে রুটি জোগাড় করাটা তো খুব একটা কঠিন কৃতিত্বের কথা নয়।

—তুমি মেয়েদের বিয়ের কথাই বলছ বোধ হয়।

—হ্যাঁ, আপনি বিয়ে করবেন না? চিরকাল রুটির জন্যে এমনি মাস্টারি করে বেড়াবেন?

সুমনা যেন গাম্ভীর্যে ডুবে গেলো, গাঢ় গলায় বললে—চিরকালের সম্বন্ধে আমরা একটা কিছু স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না, তাই তার কথা থাক। তার সম্বন্ধে সরাসরি কিছু বলতে গেলে নিতান্ত অসম্ভব শোনাবে। তবে যতোটুকু এখন দেখতে পাচ্ছি, বেশ পরিষ্কার বলতে পারি, বিয়ে নামক বাবুয়ানা আমার পোষাবে না, ললিতা।

—বাবুয়ানা! ললিতা চমকে উঠলো।

—কার কাছে ওটা ধর্ম বা সপ্তম-স্বর্গ, তা নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই না, অন্তত আমার কাছে ওটা এখন একটা নিছক বিলাসিতার মতো শোনাচ্ছে। সুমনার কথার অন্তঃপ্রবাহে করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস

যেন স্পন্দিত হতে লাগলো : আমার একটি ভাই তোমার সঙ্গেই আসছে বার ম্যাট্রিক দেবে, বোন ইস্কুলে পড়ছে এই ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস, বাবার চাকরি নেই বহুদিন—এদের সমস্ত ভার এড়িয়ে শারীরিক একটা বিলাস নিয়ে তে আর মত্ত হতে পারি না। মেয়ে হওয়া মানেই তো আর অকর্মণ্য হওয়া নয়, স্বার্থপর হওয়া নয়। জীবনে একমাত্র বিয়ে করাই কি আমাদের কাজ ?

ললিতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। পরে স্তিমিত গলায় জিগগেস করলে : তবে যতোদিন না আপনার ছোট ভাই মানুষ হচ্ছে ততদিন আপনাকে কায়ক্লেশে এই জীবিকা জোগাড় করে বেড়াতে হবে ?

—কায়ক্লেশটা যে অত্যন্ত আরামের, ললিতা। গর্বে সুমনার সমস্ত মুখ উল্লাসিত হয়ে উঠলো : আর সংসারে প্রেমের চেয়ে জীবিকাই আজকাল বেশি দুষ্প্রাপ্য। ছোট ভাই মানুষ হলে পর কী করবো, জানি না ; কিন্তু বিয়ে করা ছাড়াও আমাদের করবার আরো অনেক কাজ আছে। একমাত্র স্বামীর মধ্য দিয়েই আমরা অমর হতে আসিনি। সুমনা হঠাৎ উঠে পড়বার চেষ্টা করলো : কিন্তু এ-সব তোমার কাছে কী বাজে বকছি। তুমি যেন কিছু মনে কোরো না, ললিতা।

ললিতা তার দিকে বিস্ময়-বিগাঢ় চোখ মেলে চেয়ে রইলো : কিন্তু বিয়ে না করে আপনি এতো কাল কী নিয়ে থাকবেন ?

সুমনা তরল কণ্ঠে অজস্র হেসে উঠলো : কেন, নিজেকে নিয়ে থাকবো। আমার কাছে আমিই তো সম্পূর্ণ, যথেষ্টেরো অতিরিক্ত। থাকবো আমার স্বপ্ন, আমার কাজ, আমার আদর্শ নিয়ে—আমার মাঝে আমার নিজেরেই কোনো অন্ত আছে নাকি ?

—কিন্তু এই ভাবে কতো দিন থাকতে আপনার ভালো লাগবে ?

—এমনিতে, বেঁচে থাকতেই বা মানুষের কতো দিন ভালো লাগে ? সুমনা টেবিলের উপর থেকে তার ব্যাগটা তুলে নিলো : বিয়ে

করেইবা কতো আমাদের সার্থকতা, জানতে কিছু বাকি নেই, ললিতা। ভাগ্য সবায়ের জন্যে সমান পথ তৈরি করে দেয় না—আমাকে টেনে এনেছে না-হয় সে এই রিক্ততার পথে, এই সংগ্রামের আবর্তে। তুমি ভাবছো না-জানি এ কতো বড়ো নিঃসঙ্গতা, আমার চোখ দিয়ে একে দেখ, দেখবে এই স্বাধীনতায় তৃপ্তির আর পার খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশ আমাদের শূন্য মনে হয়, আকাশে আকাশ আছে পরিপূর্ণ হয়ে—পরের বিচারে আমাদের কী এসে যায়!

—কিন্তু এমনি যদি হয়—কথাটা ললিতা শেষ করতে পারলো না।

—কী হয়?

—যে, আপনার জীবনে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ একদিন প্রেম দেখা দিলো!

—দেবে। সুমনা আবার গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো: কিন্তু তাকে আমি আবেগের সেঁক দিয়ে লালন করতে পারবো না, আমার সময় কোথায়? আমার উদ্দাম কর্মের স্রোতে পড়ে সেই বুদ্বুদ কবে যাবে মিলিয়ে। সুমনা আস্তে একখানা হাত বাড়িয়ে ললিতার ডান হাতখানা আলগোছে টেনে নিলো; বললে,—তেমন দুয়েকটা গর্ডিয়ান্-নট্ কি এতদিনে আমি কেটে বেরিয়ে আসি নি? কিন্তু জীবনে আমার ঐ লক্ষ্য ললিতা, প্রেমের চেয়ে কর্তব্য আমার কাছে ঢের বড়ো জিনিস।

সেই স্নেহশীতল স্পর্শের মাঝে ললিতার সমস্ত ভিখারি মন নিঃশব্দে হাহাকার করে উঠলো: কিন্তু কেন আপনি এই নিষ্ঠুরতা করতে যাবেন?

ধীরে-ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে সুমনা বললে,—নিষ্ঠুর না হলে বাঁচবো কী করে বলো?

—কিন্তু সেই বাঁচাই কি সত্যি বাঁচা?

—আমার কাছে অন্তত তাই। সুমনা দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে: আমার বাঁচা শুধু একজনকে নিয়ে—সে

কেবল আমি। তার বেশি আর কাউকে আমি চিনি না, চিনতে চাইও না। আচ্ছা, আজ তবে আসি। বলে বারান্দা ঘুরে সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেলো।

সন্ধ্যা উঠেছে অন্ধকারে ঘনিয়ে। ললিতার হাতের সামনে সুইচ-বোর্ড, তবু হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাবার তার ইচ্ছে হলো না। চেয়ারে নিস্পন্দ হয়ে শূন্য চোখে সে কালো, অপরিচ্ছন্ন দেয়ালটার দিকে চেয়ে রইলো।

সুমনা যখন আসে, তখন বাইরে থেকে নিয়ে আসে সে প্রখর উন্মুক্ততা। ছোট একটা শঙ্খের মাঝে যেমন তরঙ্গভঙ্গিম সমুদ্রের গর্জনের আভাস শোনা যায়, তেমনি সুমনার কথার ছটায়, পায়ের ক্ষিপ্রতায়, কর্মোদ্‌যাপনের সঙ্কল্পে, উচ্চারিত হয়ে ওঠে বিশাল একটা জীবনের স্তোত্র। সেই জীবনের জন্যে ললিতার রক্ত হঠাৎ প্রতি বিন্দুতে পিপাসিত হয়ে ওঠে। তারো চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অনাবিষ্কৃত, দীর্ঘ-দূর সমুদ্র, ইচ্ছে করে সে-ও তাতে উড্ডীন করে দেয় তার বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত পাখা। নিষ্ঠুর, রুক্ষ রেখায় ঠিকরে পড়ুক এই গতির বিদ্যুদ্দীপ্তি, আকাশময় থাকুক তার এই যাত্রার অবাধ সঞ্চরণ।

প্রতীক্ষায় আর ক্ষয় করা নয়, নিজের মাঝে নিজের একান্ত পরিচয় খোঁজবার জন্যে ললিতা এখন থেকে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলো। শুধু বাঁচবার সাধনায় সে বড়ো হবে, নিজের মাঝে খুঁজে পাবে সে এই সাধনার সমাপ্তি।

॥ আট ॥

পাশের বাড়ার কল্যাণী গোড়ার দিকে ললিতার খুব বন্ধু হয়ে উঠেছিলো—ললিতা এ-বাড়ির মেয়ে, কল্যাণী ও-বাড়ির বধূ—একই দিনে তাদের বিয়ে হয়। এবং বিয়ের অব্যবহিত পরে স্বামি-সান্নিধ্যের নেপথ্যে মেয়েদের শরীরে-মনে যে কতোগুলি অবর্ণনীয় আনন্দ ও লজ্জা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে তা যেন সম্পূর্ণ ভোগ করা যায় একে-অন্যকে বন্ধুতার ভাগ দিয়ে। ঘটনার সেই আকস্মিক সমসাময়িকতা থেকেই তাদের বন্ধুতা। এবার ললিতা দীর্ঘকালের জন্যে বাপের বাড়িতে কায়েম হতে এসেছে দেখে কল্যাণী তাদের সেই পুরানো বন্ধুতাটা ঝালিয়ে নিতে এসেছিলো।

বেশি সময় তার হাতে নেই, সংসার তাকে প্রায় দেউলে করে ছেড়েছে। এখনো সে আগের মতো বেশি কথা কয় বটে, কিন্তু তার এই চটুলতায় নেই তেমনি নির্বাধ নির্মলতা। কথার সুরে-ছটায় কেমন-একটা কৃত্রিমতার ঝাঁজ এসে গেছে, অন্তত ললিতার তা মনে হয়। অত্যধিক পেট পুরে খেয়ে যেমন চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে, তেমনি সুখের অতিস্ফীতিতে কল্যাণীর সর্বাঙ্গে যেন উথলে উঠছে অহঙ্কার। সুখ জিনিসটা যে কতো সঙ্কীর্ণ, কতো কুৎসিত, তা যেন স্পষ্ট ধরা পড়ে কল্যাণীর এই অননুপাতিক মেদবিস্ফারে। সুখকে পণ্য করতে গিয়ে সে নিজেও হয়ে উঠেছে একটা উপাদান—সহজ-প্রাপনীয় একটা বিলাসের প্রসাধন। তার সঙ্গে ললিতা আর নিজের মিল খুঁজে পায় না। পাওয়া অসম্ভব।

শরীরের যে মাধুরী আগে রেখায়-রেখায় ঝর্ণার রূপালি জলের মতো ঝিরঝির করে বয়ে যেতো, তা আজ মাংসের পাথরে পড়েছে ঢাকা। তার স্বভাবের সবুজে আজ হারিদ্র আভা পড়েছে—তার

অভিজ্ঞতার পাকা রঙ। কদিনেই সে যেন ললিতাকে কতো বছর ছাড়িয়ে গেছে। বিয়ে মেয়েদেরকে যে কতো সহজে নিঃশেষ করে দেয় তার নিঃসংশয় প্রমাণ এই কল্যাণী। তার সাজগোজ, আড়ম্বর-আয়োজন, কথন-উপকথন সব কিছু দিয়ে এই সত্যই সে অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে বিবাহিত। তার কৌমার্যে বা সাধব্যে দুই অবস্থাতেই, তার এই বিবাহিতব্যতাই যেন তার জীবনের পরম প্রেরণা ও একমাত্র সত্য। সুমনা যখন ঘরে আসে তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসে দূর পৃথিবীর গন্ধ, দিগন্তের দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কেত, আকাশময় মুক্তির মুখরতা; আর কল্যাণী যখন এলো, তখন তার চারধারে আবিল উপকরণের স্তূপ, শৃঙ্খলের আভরণ, নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখার নির্জীব নিশ্চিন্ততা। হঠাৎ কেমন ললিতার পাখার ছন্দপতন ঘটলো।

—কী করছ ভাই, লিলি। কল্যাণী আদরে ঢলোঢলো গলায় ললিতার গা ঘেঁসে পালঙের উপর বসে পড়লো। তার গায়ে একটা ঠেলা মেরে বল্‌লে,—বরের কাছে চিঠি লেখবার জন্যে বুঝি পুঁথি ঘাঁটছো?

ছড়ানো-ছিটানো বই-খাতাগুলি গুছিয়ে রাখতে-রাখতে ললিতা নির্লিপ্ত গলায় বললে,—তোমার কাজকর্ম সব চুকে গেলো?

—মরলে পরে যদি চোকে। নিচে পুরন্ত ঠোঁটটা একটু উলটে কল্যাণী বললে,—ঘর-দোর ঝাঁটপাট দিয়ে, কাপড় কুঁচিয়ে, বিছানা-পত্তর পেতে এই একটুখানি ফাঁক পেয়েছি ভাই। তা বেশিক্ষণ বসবার কি জো আছে? ছেলেটা কখন ট্যাঁ করে ওঠে ঠিক নেই। এমন কাঁদুনে হয়েছে যে কী বলবো?

ললিতা জানে এ-সব কথা বলতে পারলেই কল্যাণী খুশি—এ-সব কথা বলবার জন্যেই সে লোক খুঁজে বেড়ায়। তাই তাকে একটু উস্‌কে দেবার জন্যেই সে বল্‌লে,—শুনেছি কাঁদুনে ছেলেরা নাকি পরে খুব মস্ত হয়।

—হ্যাঁ, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাকি তাই ছিলো। কল্যাণী মুখে যেন আরো একটু পৃথুল হয়ে উঠলো : তা তুমি তো ভাই দেখছি ছেলের বদলে কোলে একরাশ বই নিয়ে বসেছ। বছর তো কবে পুরে গেছে। চিবুকে ভাঁজ ফেলে কল্যাণী বিস্বাদ মুখে হেসে উঠলো : এই সব শুকনো পাতা ঘেঁটে কী রস পাও শুনি? বর বুঝি ইংরিজিতে মাই-ডিয়ারি চিঠি চায়?

গম্ভীর মুখে ললিতা বললে,—বরের কাছে চিঠি লেখবার জন্যেই বুঝি মেয়েরা লেখাপড়া শেখে?

—তা ছাড়া আবার কি? আলস্যের ভারে কল্যাণী একটু শিথিল হয়ে পড়েছিলো, তর্ক করবার উৎসাহে এবার সে সোজা হয়ে বসলো : বিয়ে করার পর মেয়েদের বিদ্যে আর কোন কাজে লাগে শুনি? ধোবার হিসেব লিখতে গিয়ে তো আর কবিতা লেখা চলে না, আর চাল-ডালের ফর্দ রাখতে গিয়ে বড়ো জোর একটা মিশ্রযোগ। তোমার য়্যালজেব্রা-জিওমেট্রি যে তখন মাঠে বসে কাঁদছে। ছেলের যখন তুমি কাঁথা সেলাই করছ, তখন কী এসে যায় তোমার ভূ-ধাতুর বিধিলিঙের রূপ কী!

তার কথাগুলিকে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। তার তর্কের একটা স্থিতিবিন্দু আছে। সেটা ললিতা মনে-মনে স্পষ্ট অনুভব করলো। বললে,—কিন্তু বিয়ে যারা করে না?

—বিয়ে আবার করবে না! ঢেঁকি হয়েছে তো ধান না ভেনে এরোপ্লেন হয়ে আকাশে উড়বে! কল্যাণী শরীরে তাচ্ছিল্যের একটা ঢেউ তুললো : বিয়ে না করে যাবে কোথায়? বিদ্যুতের মতো যতোই কেননা ঝিলিক দাও, একসময়-না-একসময় মেঘ গর্জ্জাবেই। তলোয়ার যতোই শানাও না কেন, সেই তলোয়ারই হবে বঁটি, আর সেই বঁটিতেই হবে কুটনো কুটতে। বিয়ে করবে না! আঁচলে করে সাগর সেঁচবে!

—বিয়ে করুক আর না করুক—ললিতা নিরুত্তেজ, শান্ত গলায়

বললে,—মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে কী দোষ? মেয়েরা কী কেবল বিয়ের জন্যেই বিদুষী হবে, আত্মোন্নতির জন্যে নয়?

কল্যাণী হাসিতে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো: ঐ বিয়েই তো মেয়েদের চরম আত্মোন্নতি। আর সেই আত্মোন্নতি লক্ষ্য করেই তো মেয়েরা বিদ্যের একেকটি বস্তাবাহী জাহাজ হয়ে ওঠে। যে যতো বড়ো বিদ্যানী, তার সেই মাপে ততো বড়ো বর। মেয়েদের শিক্ষাটা ব্যক্তিগত নয়, বিষয়গত।

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ললিতা বললে,—তুমি যে খুব বড়ো-বড়ো কথা বলছ।

—বলতেই হবে। বিদুষীদের কাছে তো স্বরে-অ স্বরে-আ আওড়ালে চলবে না। একটু সংস্কৃত করে দেব-ভাষায় কথা কইতে হবে বৈ কি! কল্যাণী ললিতার হাতের আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে লাগলো: নইলে, মনে করো, নিজের চারিত্রিক উন্নতিই যদি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আসল উদ্দেশ্য হতো, তা হলে কোনো গ্র্যাজুয়েট মেয়ে বিয়ের বেলায় তার স্বামীর ডিগ্রী নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতো না। তোমার মাষ্টারনি তো শুনছি বি-এ পাশ, তাকে জিগগেস কোরো তো, সে একটা ম্যাট্রিক-ফেল ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি আছে? রোজগারের প্রশ্ন তুলো না, জিনিসটাকে একটা থিওরি হিসেবে বিচার করে দেখ। ধরোই না হয়, সে আর-আর দিক থেকে মনোনীত পাত্র—স্বাস্থ্য বলো, চরিত্র বলো, চেহারা বলো —ধরো, তার একটা স্বচ্ছন্দ আয়ও আছে—তাকে করবে বিয়ে তোমার ঐ বি-এ পাশের পাখনা-মেলা প্রজাপতিরা? শিক্ষা তো তার নিজের উন্নতির জন্যে, সে-শিক্ষাকে সে বিয়ের মূলধন হিসেবে খাটাবে কেন?

ললিতা বললে,—এর মধ্যে হয়তো একটা মনস্তাত্বিক কারণ আছে। মেয়েরা তাদেব স্বামীর কাছে হয়তো একটা বৃহত্তরো ব্যক্তিত্ব চায়।

—যার কাছে তারা চিরকাল বশীভূত থাকতে পারে। মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে কল্যাণী বললে,—সেই অবনতিই যদি স্বীকার করবে, তবে ঘটা করে মনকে ক্ষুধিত রেখে শরীরে জীর্ণ হওয়া কেন? এই যে পাশ-করার হিড়িক পড়ে গেছে মেয়েদের মধ্যে, তোমায় বলতে কি ললিতা, আমার তো মনে হয় মেয়েদের একটা সস্তা ফ্যাসান, আমাদের মায়েদের আমলে যেমন ছিলো পাছা-পেড়ে শাড়ি। বিয়ের বাজারে ওটা হলো মেয়েদের গেট-পাশ, বর ওজন করবার নিক্তি। আমরা ভাই বোকা-ছোকা মানুষ, এক পাল্লায় নিজের বইর ভার রেখে স্বামী ওজন করি নি। বাবা-মা যাঁর সঙ্গে সাত পাক ঘুরতে বললেন, তাঁর সঙ্গে দিব্যি সাত জন্ম ঘুরে আসতে রাজি। চলতে-চলতে হয়তো একবারো সময় পাবো না যে খুঁজে দেখবো তাঁর কতোখানি যোগ্যতা। লেখাপড়া না-শেখার অনেক, অনেক দোষ, লিলি। কিন্তু তুমি, তুমি কেন এই সব বিদ্যের দোকান দিয়ে বসবে? কল্যাণী গোছানো বইগুলি ছত্রখান করে দিলো: ওরা যা খুসি করুক গে, তোমার কিসের ভাবনা?

ললিতার দুই চোখ অবসীদমান দিনের আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে এলো। ভারাতুর গলায় বললে,—এ বইর মধ্য দিয়ে জীবনের আমি একটা খুব বড়ো স্বপ্ন দেখতে পাই, কল্যাণী।

—বইর মধ্য দিয়ে? তার চেয়ে, হাতিতে গাছে চড়ে বা আরশুলায় রক্ত আছে, এমন একটা অবৈজ্ঞানিক কথা বললেও কল্যাণী এতো মজা পেতো না: তোমার সমস্ত স্বপ্ন কি তোমার এই শরীরে ঘুমিয়ে নেই? খালি কতোগুলি শুকনো পৃষ্ঠায়? জীবনের ইতিহাসে তোমার এই শরীরের পৃষ্ঠাটায় কতো রহস্য লেখা আছে তা তুমি যখন উদ্ধার করতে পারবে—না, বেলা গেলো, কথাটা কল্যাণী শেষ করতে পারলো না, ছেলেটা এখুনি চিল চেঁচাতে সুরু করবে। কল্যাণী উঠে দাঁড়ালো।

মুঠো করে তার আঁচলটা চেপে ধরে ললিতা তাকে বাধা

দিলো। বললে,—এই তো সবে এলে। ছেলে কাঁদলে তোমার শাশুড়িই তো আছে।

—তা আছেন বটে। কিন্তু আমাকে এমনি চিনেছে ভাই। দেখলেই এমনি এক মুখ ফোঁকলা হাসি হেসে হাত বাড়ায়—কল্যাণী যেন নিজেরই অতিমাত্র প্রশংসা করে ফেলেছে, এমনি লজ্জায় উছলে উঠলো।

তাকে ফের পাশে বসাবার মৃদু, যথাসৌজন্য চেষ্টা করে ললিতা বললে,—তা ফোঁকলা মুখে ছেলে একটু কাঁদলোই না-বা। তোমার শাশুড়ি ঠিক তাকে শান্ত করতে পারবে।

—তা হয়তো পারবেন, কল্যাণী যেন আনন্দে মথিত হতে লাগলো ঃ কিন্তু ছেলের বাপকে কে শান্ত করে! এখুনি আপিস থেকে এসে জল-খাবারের জন্যে হাঁক পাড়তে সুরু করবেন, ছেলে যদি বা বাড়ি মাথায় করে, ছেলের বাপ করবেন একেবারে পাহাড় মাথায়। শুধু খাবারের থালাটাই সামনে এগিয়ে দিলে চলবে না, সারাক্ষণ ঠায় বসে-বসে তাঁর সঙ্গে যতো রাজ্যের বাজে গল্প করতে হবে। এমন পেটুক ভাই, কল্যাণী আহ্লাদে একেবারে ললিতার গায়ের উপর গড়িয়ে পড়লো ঃ শুধু খাবার খেয়ে তার পেট ভরে না।

ললিতার গায়ের রুক্ষ রেখাগুলি উর্ণাতন্তুর মতো কোমল হয়ে এলো, রক্তে এলো যেন নেশার রঙ্গিমা। অবশ, আচ্ছন্ন গলায় সে বললে,—তোমার স্বামী তোমাকে খুব ভালোবাসে?

তেমনি ঠোঁট উল্‌টে কল্যাণী একটা বিতৃষ্ণার কৃত্রিম ভঙ্গি করলো ঃ মিষ্টি খাইয়ে-খাইয়ে প্রায় মুখ ফিরিয়ে আনলে। আমার দিকে চেয়ে তুমি কিছু বুঝতে পারো না? জালা-জালা আদর না পেলে মানুষ কখনো এতো মোটা হয়?

কল্যাণী আবার উঠে পড়লো, এখানে-সেখানে টুকিটাকি দুটো-চারটে জিনিস নেড়ে-চেড়ে শেষে সে জিগ্‌গেস করলে ঃ তোমার মাষ্টারনি এখনো আসে নি?

ললিতা বললে,—না।

—কখন আসে?

—কিছু ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে সন্ধে হয়ে যায়। অনেক কাজ কিনা—প্রতিদিন একই সময়ে সময় করে উঠতে পারেন না।

—ওঃ, কাজের তো একটি বস্তা! কল্যাণী আবার একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো: কাচের শো-কেসে যতো সব মরা, শুকনো কাজের প্রদর্শনী। কিন্তু সবই এক গোয়ালের গরু, কাজ ফুরুলেই আবার সেই পাজি।

ললিতা অনেক তর্ক করতে পারতো, কিন্তু তর্কে পরাস্ত হবার মেয়ে কল্যাণী নয়। নিজেই সে তার মতের মূর্তিমতী প্রমাণ তার অতিরিক্ত কোনো উপলব্ধিকে সে গ্রাহ্য করে না, নিজেই সে নিজের ধৃতি, নিজের সম্পূর্ণতা। জেগে যে ঘুমোয় তার মতো গভীর ঘুম আর কে ঘুমোতে পারে?

আঁচলটা গায়ের উপর বিস্ফারিত করতে করতে কল্যাণী বললে,—তোমার মাষ্টারনি যখন রাস্তা চলে ভাই, মনে হয় যেন দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জেণ্ডার চলেছেন। সরু লিক্‌লিক্ করছে চেহারা, যেন রথের চূড়ায় উড়ছে একটা লম্বা নিশান। দেমাক কী, যেন পায়ের নিচে পৃথিবীটা তার একটা ফুটবল।

ললিতা সামান্য প্রতিবাদ করলো: তুমি ভুল বলছ কল্যাণী, সুমনা-দি মোটেই সে-রকম নয়।

—নয়? বি-এ পাশের ডিপ্লোমাটা তার আষ্টেপৃষ্ঠে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের মতো সাঁটা আছে—রংদার বড়ো-বড়ো অক্ষরে।

—তেমনি, ললিতাও এবার না বলে পারলো না: তোমার সারা গায়েও তো মা-হবার বিজ্ঞাপনটা জাজ্বল্যমান শোভা পাচ্ছে।

—অহঙ্কারের কথা যদি বলতে চাও, কল্যাণী উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো: মেয়েদের এই সন্তানই হচ্ছে আসল সার্থকতা—তাদের প্রেমের একটি পরিপূর্ণতম মুহূর্তের পরিচয়—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার

একটি প্রাণময় প্রতিনিধি। এর চেয়ে তুমি আর কী বড়ো সৃষ্টি করতে পার, আর কিসের মাঝে তুমি তোমার পূর্ণতার স্বাদ পাবে জিগগেস করি? বুঝলে লিলি, বড়ো-বড়ো কথা ইচ্ছে করেই বলতে চাই না, কল্যাণী ঝলসে উঠলো: কিন্তু, নিষ্ফলা মরুভূমির মাঝে কেবল জ্বালাই আছে, শক্তি নেই একবিন্দু। পোড়াতেই তা পারে, ঘাসের একটি কণাও পারে না ফোটাতে। কিন্তু পাহাড় চিরে ঝর্ণা যখন অনর্গল হয়ে ওঠে—

—হ্যাঁ, তখনই শক্তির শোভা। আমি তা জানি, কল্যাণী। ললিতা উঠে দাঁড়ালো: সুমনা-দি সেই শক্তিতেই তপস্বিনী। যা-মাত্র উৎপাদন, ফুল থেকে পতঙ্গ পর্যন্ত যাতে উন্মুখ, তাকে তুমি রূপসৃষ্টির একটা বড়ো আখ্যা দিয়ো না। বিয়েটাই মেয়েদের জীবনের প্রধান কারুকলা নয়। আমরা সামান্য একটা যান্ত্রিক প্রয়োজনের অনেক উপরে।

—তুমি দেখছি, ছোঁয়াচ লেগে এরি মধ্যে বিষিয়ে উঠেছ। কল্যাণী ঠোঁট কুঁচকোলো: যান্ত্রিকতা কোথাও নেই বলতে পারো? এত বড়ো একটা বিশ্বপ্রকৃতি—যার সম্পদ, যার ঐশ্বর্যের নেই অন্ত, তা পর্যন্ত একটা যান্ত্রিক নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছে। তেমনি আলো দিয়ে চলেছে সূর্য, ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে যাচ্ছে ঋতুর মিছিল। যার যা নিয়ম, তাই পালন করাই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু এত কথা ঠাট করে তোমাকে বোঝাতে যাবার কী হয়েছে। কল্যাণী আবার তার তরল গলায় নেমে এলো: তুমি নিজেই একদিন বুঝবে, যখন তোমার শরীরের মেঘস্তর সরিয়ে উদয় হবে জ্যোতির্ময় শিশু-সূর্য, তখনই বুঝবে ললিতা, এই যন্ত্রের কী মহিমা। তখন কোথায় তোমার এই কেতাবি বিদ্যে, কোথায় বা কলেজি চেকনাই। মেয়েদের সমস্ত শরীরে-মনে মেয়ে হওয়াই হচ্ছে আসল নিপুণতা। যাই বাপু, কল্যাণী দরজার দিকে এগিয়ে এলো: মেয়ে হওয়ার ট্যাক্‌সো দি গে যাই। বলে হাসতে হাসতে যেমন এসেছিলো তেমনি চুপিচুপি গেলো বেরিয়ে।

এরি জন্যে কল্যাণীকে ললিতার ভালো লাগে না, তার শরীরের ছোঁয়ায় নিজের শরীর যেন অশৌচে অবসন্ন হয়ে আসে। তার চোখের সামনে যে আকাশ রয়েছে প্রসারিত, কল্যাণী যেন তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয় দেহের একটা উদ্ধত দেয়াল, যার আড়ালে জীবনের সকল অর্থ, সকল রহস্য অস্পষ্ট, অবাস্তব হয়ে আসে। যেন দেহকেই বহন করবার জন্যেই জীবন, জীবনকে বিকশিত করবার জন্যে দেহ নয়! যেন পিলসুজের গায়ে সূক্ষ্ম কাজগুলি স্পষ্ট করে দেখাবার জন্যেই প্রদীপ! কল্যাণীর গায়ে যেন সঙ্কীর্ণ কারাকক্ষের আবিল, অবরুদ্ধ একটা গন্ধ কেবল ঘুলিয়ে উঠেছে, তার পাশ ঘেঁসে বসে স্বচ্ছন্দে যেন নিশ্বাস টানা যায় না।

ললিতা পালঙ ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। তারার অশ্রুবিন্দু ফোটাবার জন্যে আকাশের চোখ একটু-একটু করে বেদনায় তরল হয়ে আসছে। কল্যাণী এখন হয়তো রান্নাঘরে অনেক রকম তুচ্ছতায় রয়েছে আত্মহারা, কিংবা, যদি-বা তার হাতে এখন অবসর এসেছে, ছেলেকে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে উঠে এসেছে ছাদে, একা নয়; পাটি বিছিয়ে বিশ্রামে শরীর এনেছে রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো শিথিল করে, সেখানেও সে নয় একাকী। তার সামনে, আর আকাশের শূন্যতা নয়, তার স্বামীর উপস্থিতি। হয়তো সেই সব ছোটখাটো কথা, ছোটখাটো স্তব্ধতা—যাদের ক্রমান্বিত পৌনঃপুনিকতায়ো নতুনত্বের আর শেষ নেই।

এরি জন্যে কল্যাণীকে তার ভালো লাগে না, সদর্থক করে বলতে গেলে, তাকে তার ভয় করে। সে যেন উন্মথিত করে যায় স্মৃতির সমুদ্র, ফেলে রেখে যায় নিষ্পাদপ কূলের নির্জনতা। সে যেন আসে তাকে মনে করিয়ে দিতে যে সে বিবাহিত, প্রমাণ দিয়ে তার পরিচয়কে শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ করে আনতে। তার সমস্ত কথা যেন ঘনীভূত হয়ে একটি তারার উজ্জ্বলতায় কোমল হয়ে ওঠে। সেই তারার দিকে চেয়ে তার মনে পড়ে, সেও একদিন দেখতে চেয়েছিলো

স্নিগ্ধ একটি গৃহকোণের স্বপ্ন, একটি সুখস্পর্শ শয্যার শীতল শুভ্রতা। সেও একদিন কার স্পর্শে দ্রবীভূত হবার জন্যে তনুতে রেখেছিলো যৌবনের তুষার জমিয়ে। মনে পড়ে যায় মহীপতির সেই ধ্যানগম্ভীর নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা—তাব সেই প্রতীক্ষমান মুহূর্ত—তারকার আকাশে রূঢ় রৌদ্রোদয়। চিন্তার ধারাটা যখন স্বপ্নের প্রান্তর পেরিয়ে মহীপতিতে এসে আঘাত পায়, তখন ললিতার সমস্ত স্নায়ু শিরা হিংস্র সাপের মতো বিষে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। তখন আকাশে তারার অর্থ যায় বদলে। সেই তারা গৃহাঙ্গনের দীপের সঙ্গে আর ঔপম্য বোধ করে না, হয়ে ওঠে স্বাধীন, স্বয়ম্ভূত একটা সঙ্কেত। বহু দূর থেকে তাকে যেন বহু দূরের পথে ডাক দিতে থাকে।

কল্যাণীকে তার ভালো লাগে না, তার এই অশুচি সান্নিধ্যে সে তাকে ক্ষণকালের জন্যে দেহ-মনে কাতর, খর্ব, দুর্বল করে তোলে। সেই নীড় গেছে ভেঙে, সেই প্রতীক্ষার পরে দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে উদার, উন্মুক্ত জীবন। বিধাতা তাকে যেই অপার নির্জনতায় ডাক দিয়ে নিয়ে এলেন, সেইখানেই আবিষ্কার করবে সে তার পরিপূর্ণ প্রয়োজন। সে একা, সে নতুন, সে এসেছে অতীতকে অতিক্রম করে। চোখে যদি-বা তার বিষণ্ণ কুয়াশা এসে থাকে, তা মুছে যাবে তার এই দীপ্ততরো চেতনার রূঢ়তায়। সে পতিবত্নী—এই তথ্যটা এখন তার জীবনের একটা কলঙ্কিত অঘটন : সে স্বাধীনকর্তৃকা—এই তার নিজের বিশাল পরালব্ধি। থাক কল্যাণী তার হাঁড়ি-কুড়ি, কাঁথা-পেনি নিয়ে ; ললিতার আছে এই সদা-সদ্য নবীনতার চেতনা।

ভাগ্যিস কল্যাণী জানে না ললিতার এই পরিবর্তনের কাহিনী। জানলে কী না-জানি সে পরামর্শ দিতো। হয়তো বলতো, স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দেবতাদের কাছে আরাধনা করো, নয়-বা বেরিয়ে পড়ো নিজে সন্ন্যাসিনী হয়ে। সে-ও এক হিসেবে স্বামীরই

অনুগমন করা হবে। তার চেয়ে আত্মহত্যা করলেও তো সহজতরো সমাধান হয়ে যায়। নিজেকে হত্যা করার চাইতে উদ্‌ঘাটিত করায় বেশি মহত্ত্ব। ঐ জীবন্মৃত্যুর চাইতে উত্তরঙ্গ একটা ফেনিলতা অনেক বেশি কামনীয়। ললিতার জীবনের কাছে কিছু আর বড়ো নয়ঃ জীবনধারণের চাইতে জীবন-বিকিরণ। ললিতা তার জীবনের নতুন পৃষ্ঠা ওলটাবে।

॥ নয় ॥

অনুভবের উত্তাপে আকাশ এসেছে ঘনিষ্ঠ হয়ে, অন্ধকার ঘরের কিনারে কার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ললিতা চমকে উঠলো।

—সুমনা এখনো আসে নি?

কণ্ঠস্বরে সৌরাংশুকে চেনা গেলো। হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে প্রচ্ছন্ন খুশিতে ললিতা বললে,—ও! আপনি? আসুন। না, সুমনা-দি এখনো আসেন নি। টেবিলের সামনে ললিতা চেয়ারটা একটু ঠেলে দিলো: বসুন, এক্ষুনি এই এসে যাবেন হয়তো।

দ্বিধায় সঙ্কুচিত হয়ে সৌরাংশু নম্র গলায় বললে,—না। এলে আমার একটু কথার দরকার ছিলো। তা থাক, আমি আমার ঘরেই না হয় অপেক্ষা করবো।

—তা এখানেও অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারেন। ললিতা খাট থেকে বইগুলি টেবিলের উপর তুলে রাখতে লাগলো: একা-একা আছি, একটু না-হয় আপনার সঙ্গে গল্প করা গেলো।

দুর্বল, কুণ্ঠিত একটা ভঙ্গি করে সৌরাংশুকে চেয়ার টেনে বসতে হলো অবিশ্যি। হাতের কাছে বই একটা নাড়তে-নাড়তে ধরা গলায় সে জিগগেস করলে: আপনার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

—রক্ষে করুন। ললিতা শব্দের একটা কশা হানলো: রাতদিন পড়া—পড়া—আমি আর পারি নে সত্যি। সুমনা-দি সব সময়ে এমনি মুখ গোমরা করে থাকেন যেন একটি জিওমেট্রির প্রবলেম। মাইনে দিয়ে তাঁর কাজ পেতে পারি, সেবা দিয়ে যেন তাঁর বন্ধুতা পেতে পারবো না। মানুষ তো নয়, দুর্গের একটা দেয়াল। ললিতা

নির্ভাঁজ গলায় অপার সারল্যে খিল খিল করে হেসে উঠলো, সৌরাংশুর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে সেল্‌ফের ফাঁকে ঢুকিয়ে রাখতে-রাখতে বললে,—আপনি তো আমার মাস্টার নন যে আমার পড়াশোনার হিসেব নেবেন? অন্য কথা বলুন, বই ছাড়া কি মানুষের আর কিছু বলবার নেই?

ক্ষণকালের জন্যে সৌরাংশু ললিতার মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলো—সেই মুহূর্তমাত্র দৃষ্টিস্ফুরণে এক নিমেষে সে যেন চিনে ফেলেছে ললিতাকে। এই অল্প দিনেই তার মাঝে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন এসে গেছে! শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে যখন প্রথম সে এ-বাড়িতে পা দেয়, তখন তার দু'-পায়ে ছিলো লজ্জার জড়িমা, চোখের দু'-পাতায় ছিলো ছলোছলো নম্র বিষণ্ণতা—মুখের উপর ছিলো একটা কাতরতার কুয়াশা। দেখতে দেখতে সে কুয়াশা গেছে কেটে, মুখের সে একটানা কাতরতার বদলে এখন তাতে থেকে-থেকে ক্ষণস্ফুরিত ত্বরিত ভাবদীপ্তি উছলে পড়ছে। পায়ে এখন লঘুতরো ক্ষিপ্রতা, শরীরের প্রতিটি রেখা উঠেছে লীলায় ধারালো হয়ে। ললিতা যেন এখন একেবারে নতুন মানুষ, নির্মোক খসিয়ে বেরিয়ে এসেছে যেন একটা সাপ, ভঙ্গিমায় পিচ্ছিল তার সর্ব্বাঙ্গ! প্রকৃতির নিয়মে হয়তো একেই বলে প্রতিক্রিয়া। পাহাড়ের গায়ে আঘাত পেয়ে তার স্রোত যেন উঠেছে বন্যায় আরো আবিল হয়ে, সেই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যেন সে অতীতের আবর্জনা। মাথার ঘোমটা যেন ছিলো তার দৃষ্টির একটা বাধা, সে খসিয়ে ফেলেছে সেই আবরণ, চোখে আজ যেন তার প্রখর জ্যোতিরুন্মেষ, উলঙ্গ ঔজ্জ্বল্য। সিঁদুরের বিন্দুটা যেন তার জীবনের গভীর ক্ষতমুখের একটা মৃত, বিশুষ্ক, কলঙ্ক-চিহ্ন, সে মুছে ফেলেছে সেই কালিমা, এখন তার স্পর্ধিত ললাটে অবারিত সুশুভ্রতা। জীবন যেন বিরাট একটা মহীরুহ, যে-শাখায় তার জীর্ণতা ধরেছিলো তা সে নিজ হাতে নিষ্ঠুর কুঠার দিয়ে যেন ছিন্ন

করেছে, পত্রপুষ্পসম্ভারে আজ যেন উৎসারিত হয়ে পড়েছে শ্যামল সমারোহ। ললিতার এ-চেহারা আর বিরহিণীর চেহারা নয়, তার ভঙ্গিতে-রেখায় নেই এতটুকু নিরাভ, স্তিমিত বিষাদশোভা, সে যেন নিষ্কাশিত একটা অসি, নির্লজ্জ তীক্ষ্ণতায় ঝকঝক করছে। অনর্গল সে হাসে, সে-হাসিতে অনুচ্চার্য বাক্যের প্রচ্ছন্ন সুষমা নেই, সে-হাসি যেন সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের একটা নির্মম কশাঘাত। অনর্গল সে কথা কয়, তাতে ছন্দের চাইতে ছটা বেশি—জীবনে তার যে বিশাল একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ করে রাখবার জন্যে ছিটিয়ে দিয়েছে সে সারশূন্য বাক্যের প্রস্রবণ। ললিতা তার জীবনে তীব্রতরো নতুনত্ব আনবার জন্যে দিয়ে চলেছে কঠিন শান, মেকি এনামেল।

তার উপস্থিতির ঘনতায় সৌরাংশু নির্জীব হয়ে এলো—উঠতে লাগলো ঘেমে। ললিতার সঙ্গে কোথায়ও সে একটা পরিমিত ছন্দ খুঁজে পায় না, তাই তার সঙ্কোচের আর অবধি নেই। সে যেন মনের একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে এসে বাক্যের পথ হারিয়ে ফেলে। সে তার মাঝে শোনে অবাঙ্ময়, নিষ্ফল কাকুতি—তার নতুনত্বের অন্তরালে সেই আদিমতম শূন্যতার হাহাকার। যতোই তার উপকরণের ঘটা থাক না কেন, সে লুকিয়ে রাখতে পারে না তার এই দয়াহীন দারিদ্র্যের দুঃখ। দেউলে হবার আগে ধনী যেমন তার ব্যয়ের উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত হয়ে উঠে, ললিতার কাঁধে যেন তেমনি একটা অমিতব্যয়িতার অতিকায় ভূত চেপে বসেছে। জীবনের যে স্রোতে সে ভাসমান, তার সন্ধান ও সমাপ্তি যেন তার স্বামী-ই। সে-স্বামীকে ফিরে পেলেই আবার তার পাখায় আনে সে বেগের বদলে উত্তাপ, প্রাখর্যের বদলে ঘনতা। তার সমস্ত বাক্যচ্ছটার আড়ালে বিরাজমান একটি প্রতীক্ষার স্তব্ধতা সমস্ত হাসির অন্তঃস্রোতে বহমান একটি কান্নার কলধ্বনি। ললিতার সঙ্গে ব্যবধান তার বিস্তীর্ণ, প্রকাণ্ড একটা ছন্দহানির ব্যবধান। কায়ক্লেশে

সে তাকে এড়িয়ে চলে, একটা দূরত্বের পার থেকে, সৌজন্য-শালীন অভিবাদন করার চেয়ে আর বেশি সে অগ্রসর হতে পারে না।

—কী, কথা কইছেন না কেন? ললিতার মুখে ললিত একটি লাস্য ধীরে ছড়িয়ে পড়লো।

টেবিলের বনাতটায় নোখ দিয়ে আঁচড় টানতে-টানতে সৌরাংশু হাসিমুখে বললে,—কী কথা কইবো?

—বা, তা আমি কী জানি? পৃথিবীতে কথার যেমন শেষ নেই, তেমনি স্তব্ধতারো অন্ত নেই শুনেছি। ললিতা নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য করে গোপনে যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে চায়ঃ স্তব্ধতা ঢের হয়েছে, এখন বলতে চাই কথা।

—বেশ, বলুন। সৌরাংশুর মুখে সেই সৌজন্যের নির্মলতা।

এইবারই মুস্কিল। ললিতা স্নায়ুতে-শিরায় ছটফট করে উঠলো। সৌরাংশুর নীরেখ, নির্লিপ্ত মুখ আবার যেন তাকে মনে করিয়ে দিলো সে বিবাহিত, সে অনেক দূরে। এবং এরি পাশে সে যেন পুরুষের একটা বাক্যিক বন্ধুতা পর্যন্ত দাবি করতে পারে না। তাকে অনর্থক এত সম্মান দেখাবার ভান করে সৌরাংশু যেন তার নারীত্বকে কতোখানি অপমানিত করছে তা সে তার উদাসীন ভদ্রতার মোহে এক তিল বুঝতে পারছে না। সে যেন নিতান্তই একটা সামাজিক জীব, মানুষ নয়—প্রথার পাঁকে তার মনুষ্যত্ব গেছে তলিয়ে। তার স্বামীর কায়িক অস্তিত্ব যেন তার জীবনের একটা কঠোর দণ্ড—তার যেন ক্ষমা নেই, স্খলন নেই। ললিতা কিছুতেই তার কাছে সেই অপরাধের গ্লানিটা অপসারণ করতে পারে না। তাকে যদি মাঝের এই একটা বছর বিবাহের একটা অভিনয় করতে না হতো —তার জীবনের অতীতে ও ভবিষ্যতে যদি থাকতো একটি অনাবৃত শুভ্রতা, তা হলে নিঃসংশয় সৌরাংশুর এ-ভদ্রতায় ফুটে উঠতো কোমলতরো প্রশান্তি, তার ভঙ্গিতে আসতো প্রশ্রয়ের শৈথিল্য। বিয়ে তার হয়েই ছিলো না-হয় একদিন, কিন্তু সে পরিচয়ে

এখনো তাকে খর্ব, খণ্ডিত হয়ে থাকতে হবে নাকি? সে কি ফিরে পাবে না আর তার পায়ের নিচে সমতল জায়গা, সকলের সঙ্গে সহজ সহানুভূতির ক্ষেত্র? সে কি চিরকাল সমাজের হাওয়ায় সম্মানের পাল ফুলিয়ে তার স্বামীর তীর ঘেঁসে-ঘেঁসে তরঙ্গ এড়িয়ে নৌকো বাইবে? একবার নিজে সে সাঁতার কাটতে পারবে না? হায়, তার স্বামী—যার মূল্যে এত তার সম্মান, যাকে কেন্দ্র করে সমাজ উঠেছে আবর্তিত হয়ে!

ভদ্রতায় সৌরাংশু ক্রমশ ম্লান হয়ে উঠছে দেখে ললিতা সোজাসুজি বলে' বসলো: আপনার কাছে আমি একটা পরামর্শ চাই।

নীরবে সস্মিত মুখে সৌরাংশু বল্‌লে,—আমার পরামর্শের মূল্য কি?

—তবু বলুন শুনি না, আমি পড়াশুনা করে কী করতে পারি?

—এ প্রশ্ন আপনার নিজেকেই জিগ্‌গেস করুন। আমি আর কী বলবো?

—আচ্ছা, ললিতার রসনা প্রখর হয়ে উঠলো: মেয়েদের জীবনে বিয়ে করাই কি সব চেয়ে বড়ো কাজ, সেইখানেই কি তাদের পরিপূর্ণ সার্থকতা? তার ঊর্ধ্বে আর কি তাদের কোনো সত্য, কোনো পরিচয় নেই?

সঙ্কোচে চুপসে গিয়ে জোলো গলায় সৌরাংশু বললে,—তার আমি কী জানবো বলুন? ভাগ্যক্রমে আমি তো আর মেয়ে হই নি।

কথার ধাক্কায় ললিতা যেন মনে-মনে দূরে ছিটকে পড়লো; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে এলো এগিয়ে: কিন্তু আপনি যদি আমি হতেন তো কী করতেন জিগগেস করি?

সৌরাংশু মৃদু-মৃদু হেসে বললে,—যা আপনি করছেন তাই করতাম হয়তো।

--আমি কী করছি ?

—দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, মাস্টারের কাছে নিয়মমতো পড়া করছেন। সৌরাংশু উঠে পড়বার একটা দুর্বল চেষ্টা করলো।

—হ্যাঁ, শুধু তাই। ললিতা গম্ভীর মুখে বললে,—কিন্তু এর চেয়ে বড়ো, খুব বড়ো, একটা কাজ করবার জন্যে আমি পিপাসায় মরে যাচ্ছি।

ভয়ে-ভয়ে সৌরাংশু জিগগেস করলে : কী ?

--সে আমার মুক্তি। আমি আমার জীবনের বিশাল একটা মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমার সম্পূর্ণ আমি হবার সাধনা।

---কিন্তু তার আগে পরীক্ষাটা পাশ করে নেয়াই কি বড়ো কাজ নয় ? সৌরাংশু এবার জোর করেই উঠে পড়লো।

--হ্যাঁ, মাস্টারমশাইরা তো তাই শুধু জানেন পৃথিবীতে। কিন্তু আরেকটা কথা আপনাকে জিগগেস করি। ললিতা দেয়ালের দিকে এক পা সরে গেলো : আমার মতো অবস্থা হলে আপনি কখনো আর শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন ?

—কেন, কী হয়েছে ? সৌরাশুর মুখ থেকে নিতান্ত অলক্ষিতে প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো।

— শ্বশুরঠাকুর তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রবধূর প্রতি হঠাৎ দয়াপরবশ হয়ে অর্থ সাহায্য করেছেন—অনেকগুলি টাকা, বাবা তা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছেন অবিশ্যি। কিন্তু সেই টাকা নেয়া কি তাঁর উচিত ছিলো ? উচিত ছিলো না তাঁর সেই টাকা তাঁদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেয়া ?

সৌরাংশু হেসে বল্‌লে,—বুদ্ধিমান কখনো টাকার ওপর অভিমান করে না। টাকা নিয়েছেন তাতে দোষ কী ?

—কিন্তু কেন তিনি নেবেন, তাঁদের সঙ্গে আমার আর কিসের সম্পর্ক ? ললিতা উত্তেজনায় আকর্ণ আরক্ত হয়ে উঠলো।

—যিনি টাকা পাঠিয়েছেন তাকে যখন আপনি শ্বশুরঠাকুর

বলে অভিহিত করলেন, সৌরাংশুর গভীর স্নিগ্ধতা ও ঔদাসীন্য : তখনই তো তাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা উচ্চারিত হয়ে উঠলো।

—রাখুন আপনার কথার পাণ্ডিত্য। ললিতা বললে,—ও শুধু নামের একটা অভ্যেস। অনেক সময়ে নাম আমরা উচ্চারণ না করেও অনেক গভীরতরো সম্পর্ক ব্যক্ত করে থাকি। সে কথা হচ্ছে না। কিন্তু, ললিতার মুখে আবার এলো উদ্দীপ্ত রক্তের জোয়ার : কিন্তু হাত পেতে আমি সেই অপমান আবার কেন কুড়োতে যাবো ? যে খোলস আমার গা থেকে একবার খসে গেছে তা আর আমি ইহজন্মে পরতে চাই না।

—কিন্তু এ-সব কথা আপনার বাবার সঙ্গে বিচার করলেই কি ঠিক হতো না ?

—সমস্ত সকাল আমি এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, কিন্তু কিছুতেই তিনি নাকি সে-টাকা ফেরৎ দিতে পারবেন না। আপনি বলুন, এ একটা গ্লানিকর ভিক্ষা নেয়া নয় ? এ অপমান কোনো মেয়ে সইতে পারে ?

—কেন, তাঁরো তো কর্তব্য পুত্রবধূর তত্ত্বাবধান করা। অপমান কিসে দেখছেন ?

—মেয়ে হন নি তো কিসে বুঝবেন এই অপমান ! ললিতা সমস্ত দেহে যেন রাগের একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : যেখান থেকে আমি আমার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে এসেছি, সেখানে আমার আবার কিসের স্থান, কিসের সম্মান ! তারপর শুনছি, জগদীশবাবু নাকি আমাকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে আসছেন। ভাবুন, একবার স্পর্ধার কী প্রচণ্ডতা !

সৌরাংশু হতবাক, নিস্পন্দ হয়ে রইলো।

ললিতা অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে গিয়ে বললে,—যে-জায়গা আমি কায়মনোবাক্যে ছেড়ে এসেছি সেখানেই ফের ফিরে যেতে হবে—আমাদের পৃথিবী কি এতো ছোট ? আমার এখন এই

অবারিত, অসম্পৃক্ত মুক্তি—চিরকাল আমার সম্মুখ-যাত্রা। আমি আর কারুর নয়, আমি আমার, একান্ত করে আমার। বুঝলেন, ললিতা আবার দরজার দিকে মুখ ফেরালো: আমাকে আপনারা সবাই পরিচয়ের এমন একটা গণ্ডির মাঝে ছোট করে দেখবেন না, আমি—আমি। এই যে—ললিতার মুখদীপ্ত আনন্দে তরল হয়ে এলো: সুমনা-দি এসে গেছেন। আসুন, সৌরাংশুর দিকে হাতের ইঙ্গিত প্রসারিত করে ললিতা বললে,—আপনার সঙ্গে এঁর নাকি কী ভীষণ জরুরি কথা আছে।

সে-কথার জন্যে সুমনার কোনো উৎসাহ দেখা গেলো না। দেয়ালের কোণে বেঁটে ছাতাটি দাঁড় করিয়ে রেখে সে ম্লান হেসে টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসলো। নির্লিপ্ত গলায় প্রশ্ন করলো: সে টাস্কগুলি সব করেছ?

আশ্চর্য, জরুরি কথাটা সেরে নেবার জন্যে সৌরাংশুও একটু উসখুস করলো না, পরম নিশ্চিন্ত মুখে আলগোছে নিচে নেমে গেলো।

—টাস্ক আজ কিছু করতে পারে নি, সুমনা-দি। সকালে বাবার সঙ্গে করেছি তর্ক, দুপুরে পাশের বাড়ির বৌটা এসে সব দিয়ে গেছে লণ্ডভণ্ড করে। অসহায়ের মতো মুখ করে ললিতা বললে,—এক-আধদিন পড়াশুনো কিছু নাই করলুম। এমনি আজ একটু গল্প করি আসুন।

সুমনার মাঝে ললিতা তার জীবনের একটা বিশাল প্রতিধ্বনি খোঁজে। সে যেন আঁচলে করে নিয়ে আসে আকাশ, তার চুলে অরণ্যের মর্মর, সমস্ত গায়ে তার নির্মুক্ত রৌদ্রের অজস্রতা। কিন্তু আজ সুমনাও যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খনিক পরে সে বললে,—আজ তবে আমাকেও ছুটি দাও ললিতা, কাল আসবো। কালকে সব টাস্ক করে রেখো।

তার ক্লান্ত, বিশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ললিতা বললে,—কাল কিন্তু

অনেকক্ষণ থাকবেন। অনেক—অনেক কথা আছে। অনেক সব ইনট্রিগিং কথা।

ছাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে ম্লান হেসে সুমনা দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

তার চলে যাওয়ার অন্ধকারে ললিতা যেন খরতরো একটা মুক্তির ঘ্রাণ পাচ্ছে। তার সমস্তগুলি মুহূর্ত যেন এলো মুক্তিতে মদির হয়ে। সে চায় জীবনে এমনিতরো একটা দ্রুততা, একটা নিষ্ঠুর, নির্বারিত শক্তি। এমনিতরো তার গতির ধূলায় আকাশের তারা যাক অন্ধ হয়ে।

অন্যমনস্কের মতো ললিতা ঘর অন্ধকার করে আবার জানলায় এসে দাঁড়ালো। নিচে, রাস্তায়, কী যে সে দেখলো হঠাৎ যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। রাস্তাটা অনেক দূর একটানা চলে গিয়ে তবে বাঁয়ে বেঁকেছে, অনেকক্ষণ ধরেই তাকে দেখতে হলো। গ্যাসের তলায় ছবিটা একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আবার কিছুকালের জন্যে সমস্ত আবছায়া।

সুমনা-দির পায়ে সেই ক্ষিপ্রতা নেই, সৌরাংশুবাবুর নেই আর সেই ভদ্রতার কাঠিন্য—দুজনে তারা পাশাপাশি পথ হাঁটছে। সুমনা-দির বেঁটে ছাতাটা সৌরাংশুবাবুর হাতে।

॥ দশ ॥

ছন্দ খুঁজে পায় সৌরাংশু সুমনার সঙ্গে: সহজ, পরিমিত ছন্দ। তারা একই গ্রাম থেকে কলকাতা এসেছে, বলতে কি, সুমনার মা খোঁজ-খবর নেবার ভার সৌরাংশুকেই দিয়েছিলেন, তার উপর যেন সে একটু চোখ রাখে। চোখ রাখা বলতে যা বোঝায়, সৌরাংশু এক নিমেষের জন্যেও তার থেকে চোখ ফেরায় নি, তার দুই স্নেহার্দ্র চক্ষুপল্লবের ছায়ায় সুমনাকে সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাদের শৈশব কেটেছে একসঙ্গে নির্লজ্জ নির্বুদ্ধিতায়, কৈশোর কেটেছে দূরে-দূরে মনের উদ্ভাসমান পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়, আর যৌবনে, পিপাসায় পাষাণাকার আকাশে, এই তাদের নির্মেঘ নিরাবরণ দীপ্তি। সুমনার সঙ্গে সে একটা সহজ সমতা খুঁজে পায়, পদে-পদে, অক্ষরে-অক্ষরে তাদের অলৌকিক মিল: অতীতের অন্ধকারে, ভবিষ্যতের শুভ্রতায়। সুমনাকে আর অনুমান করতে হয় না, সে এখন একটা প্রতিপাদিত সত্য, সৃষ্টি না করে এখন শুধু তাকে স্বীকার করবার কথা।

সুমনাদের অবস্থাটা ভীষণ ধ্বসে পড়েছে ইদানি তার বাবার চাকরি যাওয়ার পর থেকে। সুমনার সেবার ম্যাট্রিকের বছর, সমস্ত সংসার তার কাঁধে এসে চড়াও হলো। চাকরি হারিয়ে বাবা পড়লেন অসুখে, সেটা ক্ষান্ত হলো এসে পঙ্গুতায়। সমস্ত সংসার দৈত্যকায় একটা গুহার মতো সুমনার দিকে গ্রাস মেলে রইলো—পাশবিক বিরাট সেই গ্রাস। সেই থেকেই, ম্যাট্রিক পাশ করেই এক দিকে ধরলো সে ছাত্রীর বেশ, অন্য দিকে মাস্টারির পেশা—তার আঁচল পিঠের উপর কখনো স্খলিত হয়ে কখনো অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হতে লাগলো। একই জল ঝর্ণায় লীলায়িত হয়ে ফের দীঘিতে পেলো প্রশান্তি। এমনি করে সমানে চার বছর। কুড়িয়ে-কাচিয়ে যা সে

পেতো সব পাঠাতো বাবাকে, নিজের জন্যে কিছুই তার বিশেষ দরকার ছিলো না। শুধু প্রাণধারণের এই উদ্দীপ্ত মত্ততার সুখ—জীবনে এই তার একমাত্র বিলাস। তার জীবনের যে এত মূল্য ছিলো এই তার যথেষ্ট আবিষ্কার।

ছাত্রত্বের সীমানা পেরিয়ে এসে সুমনা এখন একটা নির্মোকমুক্ত নতুন সাপ, পিচ্ছল, বিসর্পিল গতির দ্যুতিতে তার এখন দুঃস্পৃশ তীক্ষ্ণতা। সেই সুমনা আর নেই: তার চুলে নেই আর সেই শিথিল অরণ্য-মর্মর, চোখে নেই সেই চন্দ্রোদয়ের বিহ্বলতা, দুটি হাতে নেই আর লতায়িত কাকুতি। সে আর যেন কবিতার আভা নয়, রূঢ় স্পষ্ট নির্লজ্জ গদ্যের কঠিন একটা টুকরো। সে মাত্র একটা অর্থোপার্জ্জনের কায়িক যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কপালে রুক্ষতা, চোখে জ্বালা, সমস্ত চেহারায় পীড়িত পিপাসা—তার দীর্ঘ দেহ, যেন শান-দেয়া শীর্ণতার ধারালো একটা ছুরি। তার দিকে দু' চোখ ভরে আর চাওয়া যায় না। তার শরীরের রুক্ষ রেখাগুলি যেন তীক্ষ্ণ শলাকার মতো সৌরাংশুর চোখ বিদ্ধ করতে থাকে।

সৌরাংশু তার সেই রেখাগুলি লাবণ্যে কোমল করে আনবে, শরীরে পুঞ্জ-পুঞ্জ সুষমার ঢেউ। মুক্তির এই খরদীপ্তি উলঙ্গ আকাশ থেকে নিয়ে আসবে সে তাকে ছায়াঘন সান্নিধ্যের নিবিড়তায়। দীপ্তি আর দাহ এক জিনিস নয়, সৌরাংশু তাকে এই বিদীর্য্যমান আগ্নেয়-গিরির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে নিয়ে আসবে প্রসারিত প্রান্তরের প্রাচুর্যে—তাকে আর সে এমনি করে শুষ্কতায় নিঃশেষ হতে দেবে না।

সমস্ত রাত সুমনা তার হস্টেলের বিছানায় ছট্‌ফট্ করে কাটালো। না পারলো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে, না-বা পারলো চিন্তা করে বার করতে একটা পথ! কিন্তু ঘুমোতে না পারুক, একটা উপায় তার খুঁজে বার করতেই হবে।

বিকেল বেলা সোজা উপরে ললিতার ঘরে না গিয়ে সুমনা চলে এলো নিচে সৌরাংশুর ঘরে। সৌরাংশু একটা ইজিচেয়ারে গা ঢেলে

দিয়ে চুপ করে বসে ছিলো। তার বসবার নির্জ্জীব ভঙ্গিতে প্রতীক্ষার আলস্য রয়েছে স্তূপাকার হয়ে।

সুমনার চেহারা দেখে তো সে অবাক। একটা পাতা-ঝরে-পড়া শুকনো গাছের মতো তার দেহে বাজছে যেন রিক্ততার হাহাকার। ঝড়ে টোল খেয়ে বেহাল একটা নৌকা যেন পারে এসে ঠেকেছে।

সুমনা হাসতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই ঈষৎ স্ফুরিত রেখাটি তার মুখের ব্যর্থতা যেন আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললো। দৃঢ় একটা সঙ্কল্পের ভঙ্গি নিয়ে সুমনা ঘরে ঢুকেছিলো, কিন্তু সামনের চেয়ারটায় বসতে গিয়ে সে যেন ভেঙে পড়লো মলিন, ম্রিয়মাণ কাতরতায়। মুখ তুলে লাজুক গলায় বললে,—আমাকে ক্ষমা করো।

·সৌরাংশু চমকে উঠলো : ক্ষমা, ক্ষমার কথা তুমি কেন বলছ ?

সুমনা নীরবে তার নরম ঠাণ্ডা দুটি চোখ প্রসারিত করে ধরলো।

সৌরাংশু জিগগেস করলে : তুমি রাজি হতে পারলে না ?

প্রাণপণে গলায় স্বর এনে সুমনা বললে, —না।

উচ্চারণের সঙ্গে ঘরে স্তব্ধতা এলো ঘন হয়ে : ভীষণ ঘোলাটে আবহাওয়া। চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে সৌরাংশু ক্লান্ত গলায় বললে,—কিন্তু কোথায় তোমার ঠেকছে, জানতে পারি ?

স্পষ্ট একটা উত্তর দিতে পেরে সুমনা এখন অনেকটা অনর্গল হতে পেরেছে। শরীরের ডৌলটা আরো একটু সহজ ও শিথিল করে সে বললে,—তুমি তো জানো, সমস্ত বাধা আমার নিজের, আমার একার সব অযোগ্যতা। আমার এখনো সময় হয় নি।

—সময় হয় নি তা তুমি কী করে বুঝলে ?

—বুঝলাম, আমি এখনো ক্লান্ত হই নি, আমার এখনো অনেক কাজ। সুমনার দুই চোখ শৃঙ্খলিত পশুর চোখের মতো রুদ্ধ আক্রোশে একবার জ্বলজ্বল করে উঠলো : আমার আরো দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করবার সময় আছে।

—কিন্তু কিসের জন্যে তোমাকে আর প্রতীক্ষা করতে হবে জানতে পাই? সৌরাংশুর গলা বিদ্রূপে ঝিলিক দিয়ে উঠলো: মেয়েরা কিসের জন্যে প্রতীক্ষা করে? তুমি কি তোমার জীবনে প্রেম খুঁজে পাও নি?

নির্জন সম্মুখীনতায় সমস্ত কথা নিঃশেষ করে বলবার অবকাশ পেয়ে সুমনা মনে-মনে উত্তপ্ত একটি আরাম অনুভব করলো। গাঢ় গলায় বললে,- প্রেম যদি পেয়ে থাকি, তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতীক্ষাও তবে পাবো।

—কিন্তু কতো কাল? সৌরাংশু এলায়িত আরাম ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে বসলো: সময়কে একটা সীমা দেবো বলেই আমরা এ জীবন পেয়েছি। তাকে আমরা সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। কাজ, কাজ, বিয়ে করা কি তোমার একটা কাজ নয়?

তৃষ্ণাহীন শুকনো দুটি ঠোঁটে সুমনা একটু হাসলো।

চেয়ারে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে সৌরাংশু অসহিষ্ণু গলায় বললে,—কিন্তু আর কতো দিন- কতো যুগ অপেক্ষা করতে হবে?

দিনান্ত-বেলার ক্লান্ত দীর্ঘ একটি রশ্মিরেখার মতো সুমনার সমস্ত দেহ একবার কেঁপে উঠলো। বললে,—তা কী করে বলবো?

—তবে, সৌরাংশু এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালো: তবে কী বলতে তুমি এসেছ?

—বলতে এসেছি, সুমনার গলা এলো ধরে: তোমার যদি সময় না থাকে, তবে আমার জন্যে আর প্রতীক্ষা কোরো না।

—বা, এ যে নভেলে-পড়া প্রেমিকার মতো কথা বলছ, সুমনা। সৌরাংশু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো: এতো দিন দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে আজ কিনা খবর দিতে এসেছ তোমার এখনো ঘুম ভাঙেনি।

—যদি তাই বলো, সুমনার চোখের দু' পাতা ভারি হয়ে উঠেছে: আমি আরো কিছু কাল ঘুমোবো।

—তাই বলো। সৌরাংশু তার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় আবার ভেঙে পড়লো। অবসন্ন গলায় বললে,—তুমি চিরদিন কেবল তন্দ্রাই চেয়েছ, সম্পূর্ণ বিশাল একটা জাগরণ চাওনি। চেয়েছ প্রেম নয়, অনুরাগের রঙিন একটা অভিনয়। কিন্তু তার কী দরকার ছিলো? কী দরকার ছিলো মেঘের ডাকে খানিকটা পেখম মেলে ধরতে?

সুমনা নিরুত্তাপ, নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—তোমাকে যে আমি ভালোবাসি তার একটা এমনি স্থূল, সামাজিক প্রমাণ দিতে হবে? আর তা না হলেই সেটা একটা অভিনয়?

—নিশ্চয়। উত্তেজনায় সৌরাংশু আবার উঠে দাঁড়ালো: সূক্ষ্মে-স্থূলে মাটিতে-হাওয়াতে মিলে আমরা মানুষ। আমি তোমাকে শুধু মনে ও কথায় চাইনি, সুমনা, কায়মনোবাক্যে চেয়েছিলাম। তুমি আমার নিঃশ্বাসের বায়ু নও, গ্রাসের আচ্ছাদন। না, তুমি এমন মেয়েলি লজ্জার মুখোস টেনো না মুখে, আমাকে বলতে দাও।

সুমনা হাসি মুখে বললে,—বলো। শুনতে আমার তো ভালোই লাগছে।

—শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার অনেক করা গেছে, এখন চোখ খুলে তাকাবার সময়। সৌরাংশু হঠাৎ কাছে এসে চেয়ারের হাতল থেকে সুমনার বাঁ হাতখানি তুলে নিলো। উজ্জ্বল, শাণিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—কিন্তু সবই কি বলতে হবে? তুমি কি কিছুই বুঝবে না?

সুমনা ভীত, পরাজিত গলায় বললে,—কিন্তু আমাকেও তো তুমি বুঝতে পারো।

তাড়াতাড়ি আরেকটা চেয়ার কাছে টেনে এনে সন্নিহিত হয়ে বসে সৌরাংশু বললে,—বলো, আমি বুঝবো, তর্ক করবো, বলো তোমার কী বলবার আছে। কোথায় তোমার বাধা?

ঠোঁটের দুর্বল রেখায় নিষ্প্রভ একটি হাসির ইশারা নিয়ে সুমনা বললে,—কিন্তু তর্ক করে তোমার সঙ্গে আমি পারবো কেন? তোমার

যা সব নির্মম যুক্তি—এই তোমার বলিষ্ঠ উপস্থিতি, তার কাছেই তো আমার জিহ্বা মূর্চ্ছা যাবে।

সৌরাংশু বললে,—তর্কে হেরেও যদি তুমি এমনি গোঁ ধরে থাকো, তবে বুঝবো কোনোদিন তুমি আমাকে ভালোবাসো নি। ও তোমার নানাজাতীয় প্রসাধনেরই একটা: জোলো একটা ভ্যানিসিং ক্রিম মাত্র।

—না, তা তুমি সন্দেহ কোরো না। আমি অত্যন্ত অসহায়।

—অসহায়!

—হ্যাঁ, সমস্ত সংসার আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

—থাকুক না, সমস্ত পৃথিবী থাকুক চেয়ে! সৌরাংশু উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

—না, ঘামে-ভিজা ভীরু আঙুল কটি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে সুমনা বললে,—আমি ছাড়া পৃথিবীতে তাদের কেউ নেই। তাদের উপবাসের রাতে আমার এই বিলাস আমি সইতে পারবো না।

—বিলাস? সৌরাংশু গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। পরে গম্ভীর হয়ে তার হাতটিকে আরো নিবিড়তরো স্নেহের আবেষ্টনে আবৃত করে ধরলো। বললে,—তোমার কর্তব্য কেবল সংসারের উপর, তোমার জীবনের উপর কোনো কর্তব্য নেই? জীবনকে সমৃদ্ধ করবার যে বিলাসিতা সেই তো তার আসল সৌন্দর্য। তোমাকে বিয়ে করতে দেখলে তোমার বাবা-মা সুখী হবেন না?

—বোধ হয় না। এতো কাছে থেকেও সুমনা যেন অনেক দূর থেকে বলতে লাগলো: দু'টি ভাই-বোনকে আমার মানুষ করতে হবে, বাবা-মার আমিই একমাত্র অবলম্বন। সংসারের কাছে আমার অনেক ঋণ।

—এই কথা? সৌরাংশু হাল্কা হবার একটা শিথিল ভঙ্গি করলো: বেশ তো, বিয়ের পরেও তো এ-কাজ নির্বাহ হতে পারে।

—অসম্ভব। সুমনা জোর গলায় বললে,—বিয়ের পর আমি সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি, আমার তখন নতুন জগৎ, নতুন প্রতিপাল্য। আমি তাদের আর তখন কেউ নই।

—কিন্তু আমি আছি। বিলীয়মান স্পর্শের উপর নতুন উত্তাপ সঞ্চার করে সৌরাংশু বললে—তোমার কিছু ভয় নেই, সুমনা আমিই তাদের দেখতে পারবো।

বিদ্রূপে চোখ কুটিল করে সুমনা বললে,—তুমিই বা তাদের কে ?

শুকনো পাতার মতো সুমনার হাত স্পর্শের বৃন্ত থেকে কোলের উপর ঝরে পড়লো। সেই হাতে কপালটা একবার মুছে সুমনা বললে,—ব্যাপারটা শুধু একটা ভরণ-পোষণের কথা না। একটা উদাহরণের কথা। তারা যখন দুঃখ-কষ্টে দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমার এই স্বার্থপরের মতো ব্যবহার—

—স্বার্থপরের মতো। সৌরাংশু আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। ভাবলো এবার আলো জ্বালে। কিন্তু আলোতে কথার সমস্ত আবহাওয়া আসবে নিষ্প্রভ, নিরর্থক হয়ে। দু' পা নিঃশব্দে পাইচারি করে এসে সে নির্মম, রুক্ষ গলায় বললে,—তুমি নিজে যখন বাঁচবে, তখন স্বার্থপর না-হওয়া ছাড়া তোমার উপায় কী। স্বার্থপরতাতেই তো তোমার জীবনের সম্পূর্ণতা, তোমার চরিত্রের মহত্ত্ব। কর্তব্যের চেয়ে তোমার প্রেম বড়ো—প্রেমই তোমার আদিমতম কর্তব্য। তুমি বাঁচবে, বাঁচবে, শরীরে-মনে বর্তমানে-ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ, প্রচুর হয়ে উঠবে—সেই সাধনার কাছে কিসের তোমার ভাই-বোন, তোমার বাপ-মা, তোমার যতো সব তুচ্ছ, কাঙাল মুখাপেক্ষীর দল।

কথার ঝড়ে সুমনা যেন সর্বাঙ্গে আহত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো। ম্লানায়মান আলোয় সৌরাংশুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলো তাতে একটা বিবর্ণ ক্ষুধা যেন হিংস্রতায় জ্বল্‌জ্বল্ করছে। পাংশু, নিরানন্দ মুখে বললে,—এ-সব তুমি কী বলছ ?

সৌরাংশু হঠাৎ সামনে সরে এসে সুমনার দুই হাত চেপে ধরলো : জীবনে তোমার আর সবাই বড়ো, কেবল আমিই তোমার কেউ নই ? তুমি সৌভ্রাত্রেরই একটা উদাহরণ হবে, প্রেমের নয় ?

স্পর্শের নিঃশব্দ গভীর ডাক শুনে সুমনাও উঠে দাঁড়োলো। অন্ধকার সরে দাঁড়ালো, হাওয়া এলো তরলতরো হয়ে। সুমনা পরিষ্কার গলায় বললে,—ইকনমিক্স্এ legal tender moneyর মধ্যে যেটা ভালো অর্থ সেটাই মানুষে সঞ্চয় করে রাখে, আর যেটা অপেক্ষাকৃত মন্দ, ওজনে হালকা, ব্যবহারে ক্রমশ যেটা জীর্ণ হয়ে এসেছে, সেটাই আগে লোকে ফেলে ক্ষয় করে। তুমি আমার জীবনের সেই অর্থ, ব্যয়ের নয়, সঞ্চয়ের।

সৌরাংশু বললে,—জীবনটা শুকনো একটা ইকনমিক্স্ নয়, সুমনা।

—আর নির্জলা একটা ইস্থেটিক্স্ও নয়, আশা করি। সুমনা অন্যমনে একটু দূরে সরে গেলো ; অভিমানে আচ্ছন্ন গলায় বললে,—কিন্তু প্রেমই যখন তাকে বলছ, তখন প্রতীক্ষাই বা তার সইবে না কেন ? তুমি কি তাকে পেয়ে ভোগ করে একেবারে ফুরিয়ে দিতে চাও ? সেই কি তোমার পরিপূর্ণতা ?

—আমি অনেক প্রতীক্ষা করেছি, সুমনা। স্বরের দীপ্তিতে সৌরাংশুর দেহ ঋজু বহ্নিশিখার মতো লেলিহান হয়ে উঠলো : কিন্তু তুচ্ছ তোমার সংসারের জন্যে আমার অমূল্য মুহূর্তগুলো আমি কেন ক্ষয় করতে যাবো ? আমি তাদের কে ? আমি কেন যাবো প্রতীক্ষা করতে ?

ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত অপরাধীর মতো সুমনা বললে,—তবে প্রেম নয়, ক্ষুধা।

—হ্যাঁ, দুর্দান্ত ক্ষুধা। শুধু শব্দের একটা ব্যবহারের জোর করে তার অর্থের গভীরতা তুমি নষ্ট করতে পারবে না, সুমনা। সৌরাংশু কঠিন মুঠিতে সুমনার হাত চেপে ধরলো : ক্ষুধার তীব্রতা থেকেই প্রেমের গভীরতা।

সুমনা কোনো কথা বললো না, হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য মৃদু একটা মোচড় দিতেই সৌরাংশু হাত ছেড়ে দিলো। সুমনা এগিয়ে এলো এবার একেবারে দরজার কাছে।

পিছন থেকে সৌরাংশু অসহায়, অস্থির গলায় বললে,—কথার জবাব দিয়ে যাও, সুমনা।

সুমনা ফিরে তাকালো না ; ভারি গলায় বললে,—আমার সময় নেই। আমার এখনো সময় হয় নি। সময় হবে কিনা তাও বা কে বলতে পারে ?

সৌরাংশু যেন চাপা গলায় আর্ত্ত একটা হাহাকার করে উঠলো : সময় হবেই না কোনো দিন ? তবে আমাকে তুমি—আমার এই ভালোবাসা কি তোমার একটা খেয়ালের চেয়েও তুচ্ছ ? আমার এই লজ্জা, এই পরাজয় এ সবের তবে কী দরকার ছিলো, সুমনা ? সৌরাংশু দৃঢ় পায়ে দু'পা এগিয়ে এলো : জবাব দিয়ে যাও বলছি।

সুমনা চলে যেতে-যেতে বললে,— আমি হয়তো এর জন্যে তৈরি হই নি। আমার পৃথিবীটা হয়তো ছোট একটা গৃহাঙ্গনে এসে সমাপ্ত হয় নি। আমাকে তুমি ক্ষমা কবো।

—তোমাকে ক্ষমা করবো ?

—যদি না-ই বা করতে পারো, তোমার সেই জ্বালার মধ্যে আমার এই জ্বালাকেও তুমি মনে করে রেখো। সুমনা যেন ঘর থেকে চলে যেতে পাচ্ছে না।

—কিন্তু এতেই কি তুমি খুব সুখ পাবে, সুমনা ?

—সুখই যদি পাবো, তবে মেয়ে হয়ে ভালোবাসতে গেলুম কেন ? কথা বলার আবেগের আলোড়নে ঘর থেকে সে ভিতরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে—ঐ কথার পর তাকে ফিরিয়ে আনা যেন ভীষণ সহজ হয়ে এসেছে—সৌরাংশুও তাকে স্খলিত পায়ে অনুসরণ করলে।

কিন্তু সবিস্ময়ে দুজনেই তাকিয়ে দেখলো বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে ললিতা দাঁড়িয়ে।

ঘর অন্ধকার, সুমনার মুখে একটা পীড়িত, বিপর্য্যস্ত বিবর্ণতা, দুই চোখ দিয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা, বেদনায় সমস্ত গতি স্তব্ধ, নির্বাপিত, আর পিছনে সৌরাংশু, সমস্ত শরীরে ব্যাকুলতার তাপ, মুখে বিচ্ছুরিত কথার আভা, দুই চোখে ক্ষুরধার হতাশার একটা দাহ—পাষাণে উৎকীর্ণ মূর্তির মতো ললিতা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তার উপস্থিতিতে সমস্ত গতি গেছে থেমে, সমস্ত কথা গেছে ফুরিয়ে, সমস্ত দীপ্তি এলো ধূসরিত হয়ে।

কী বুঝলো সে কে জানে, সুমনার মুখের উপর সে প্রায় শাসকের মতো রুখে এলো : কী, আজো পড়াতে যাবেন না নাকি ?

—না, আমাকে মাপ করো, ললিতা। সুমনা তার দিকে একটিবার তাকালো না পর্য্যন্ত, দ্রুত পায়ে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে গেলো।

আর সৌরাংশু ফিরে গেলো তার অন্ধকারে।

॥ এগারো ॥

নেপথ্যে ললিতা যতই আপত্তি করুক, বেয়াইর টাকা ধরণীবাবু বেশ মুক্ত হাতেই গ্রহণ করতেন। প্রথমত পরিণীতা মেয়ের ভরণপোষণের ভার তার স্বামি-গৃহের উপরই ন্যস্ত থাকা বিধেয়; দ্বিতীয়ত, হাতের কাছে টাকা এসে পড়লে কে না হাতের মুঠিটা একটু শিথিল করে!

বরং এ-ব্যাপারটায় ধরণীবাবু মনে-মনে আরাম পাচ্ছিলেন প্রচুর। যাই হোক, ললিতার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের সুতোটা একেবারে আলগা হয়ে যায়নি, এই সুতো ধরে সে আবার তার নিরাপদ, নিবিড় আশ্রয়ে গিয়ে একদিন অবতীর্ণ হতে পারবে। আসলে সেইখানেই তার স্থান, বাপের বাড়িতে দিন কতক সে হাওয়া বদলাতে এসেছে মাত্র।

তাই মাস আষ্টেক বাদে একদিন সকালে স্বয়ং জগদীশবাবু সশরীরে তাঁর দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হলেন দেখে তাঁর সুখের আর অবধি রইলো না।

ঘটনাটা ঠিক চোখ খুলে বিশ্বাস করবার মতো নয়। উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার মত কোনো সোপকরণ সমারোহ তো তাঁর নেই-ই, সামান্য একটা নমস্কার করতে পর্যন্ত তিনি ভুলে গেলেন। উৎসাহের আতিশয্যে জগদীশবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে তিনি বিগলিত গলায় বললেন,—আপনি হঠাৎ এই গরিবের ঘরে?

জগদীশবাবুর প্রশান্ত মুখে শীতল একটি হাসি ফুটে উঠলো। নির্লিপ্ত গলায় বললেন,—শুধু অর্থের অল্পতায়ই লোকে গরিব হয়?

—কিন্তু আপনি আসবেন, বাড়ির ভিতরে সসম্ভ্রমে তাঁকে নিয়ে আসতে-আসতে ধরণীবাবু বললেন,—আগে থেকে একটা খবর পেলে

আমরা সবাই স্টেশনে যেতে পারতাম যে। আপনার ভারি কষ্ট হলো।

—খবর দেবার সময় পেলুম কই? শূন্য চোখে চারদিকে চাইতে-চাইতে জগদীশবাবু আর্দ্রকণ্ঠে বললেন,—বৌমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কোথায়, বৌমা, আমার ললিতা-মা কোথায়?

এমনি একটা নিদারুণ শুভসংবাদ যে তিনি বহন করে এনেছেন, ধরণীবাবুর তাতে সন্দেহ ছিলো না। আবেশে গলা তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে এলো: মহী—মহীপতির কোনো খোঁজ পেয়েছেন নাকি?

—উড়ো খবর কতোই তো কানে আসে। জগদীশবাবুর মুখ পিতৃষ্ণায় ভারি হয়ে উঠলো: শুনি, কখনো হরিদ্বার, কখনো রামেশ্বর--গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন নাকি! গরু খোঁজার চেয়েও বেশি।

—ও কি ফিরে আসবে না? ধরণীবাবুর গলা হঠাৎ ম্লান হয়ে এলো।

—ফিরে না এসে যাবে কোথায়? গুরু যে ওর ঘরের দুয়ারে ওর ফেরার অপেক্ষায় বসে আছেন। জগদীশবাবু না বসে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন: বৌমা কোথায়? মা-কে যে আমি বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।

কারণটা ধরণীবাবুর কাছে এখনো স্পষ্ট হয় নি। পাশাপাশি চলতে-চলতে তিনি শুধোলেন: তবে কি—

—আমার মেয়ের যে এই সতোরোই বিয়ে। জগদীশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন,—বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ ঠিক হয়ে গেলো। চিঠি-পত্তর লেখবার সময় নেই, সোজাসুজি নিজেই চলে এলুম। আজই আবার বৌমাকে নিয়ে ফিরে যাবো। বিকেলে যাবার একটা ট্রেন আছে না?

ধরণীবাবু আপত্তি করলেন: তা, আজই কি আর হয়?

—আজই হতে হবে। হাতে আর সময় কোথায়? বৌমাকে নিজে নিয়ে যাবার জন্যে সব আমি ছড়িয়ে রেখে এসেছি—আমি গেলে তবে অন্য কথা। আরো খানিকটা এগিয়ে আসতে জগদীশবাবু

সামনে সিঁড়ি পেলেন। বার্দ্ধক্যে শরীর যে তাঁর অপটু, এ কথা তাঁর আর মনেই রইলো না। একেক পায়ে ছু'-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙোতে-ডিঙোতে তিনি উপরে উঠতে লাগলেন; সেই বলদৃপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সতেজ কণ্ঠস্বর উৎসারিত হতে লাগলো: বৌমা, আমার ললিতা-মা কোথায় গেলো?

সকালবেলা স্নান করে এসে পাখার হাওয়ায় পিঠের উপর ভিজে চুল ছড়িয়ে দেয়ালের আয়নার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ললিতা এক মনে নিজেকে তখন বিভোর হয়ে দেখছিলো। রবিবার —সকালে আজ সৌরাংশু পড়াতে আসে নি। সেই দিন থেকে সুমনার আর দেখা নেই, এ-বাড়ির আতঙ্কিত, রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়াটা যেন তাকে তাড়া করেছে; তাই এখন থেকে তার পড়া-শোনার ভার চলে এসেছে সৌরাংশুর হাতে। সময়টা ভারি একা। হাতে কোনো কাজ নেই, তাই নিজ হাতে একটি পান সেজে খেয়ে ললিতা তখন প্রায় ঠোঁট ছু'টি লালিমায় পিছল করে এনেছে। নিচেকার ঠোঁটটি উল্‌টে-পাল্‌টে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখা আর তার ফুরোতে চায় না। স্নানের স্নিগ্ধতার মতো নির্মল একটি মুক্তির অজস্রতা তার সমস্ত গা থেকে যেন উছলে পড়ছে।

—বৌমা!

ডাক শুনে ললিতা থম্‌কে দাঁড়ালো। শূন্য চোখে পাশের দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগলো—এ-ডাকের কে উত্তর দেবে।

সে ছাড়া উত্তর দেবার কেউ নেই আশে-পাশে। জগদীশবাবু ঘরের মধ্যে সটান ঢুকে পড়েছেন। তাঁকে দেখে ললিতার মুখ মুহূর্তে একেবারে নিবে গেলো। তার শরীরের নবনী-নমনীয় লাবণ্য যেন পুঞ্জ-পুঞ্জ পাষাণস্তূপের মতো এক বিরাট ভার হয়ে উঠলো। দাড়াবার জন্যে পায়ের নিচে সে যেন মাটি খুঁজে পেলো না। আঁচলটা সংক্ষিপ্ত করে এনে মাথার উপর যে একটা ঘোমটা দেয়া দরকার তা পর্যন্ত তার খেয়াল নেই।

জগদীশবাবু তার দিকে এক পা এগিয়ে এসে স্নেহপূর্ণ, বিষণ্ণ গলায় বললেন,—বুড়ো ছেলেকে চিনতে পাচ্ছ না, মা?

ললিতা তবুও প্রতিমার মতো স্থির। অসম্বৃত চুলে-আঁচলে দাঁড়াবার অসম্ভ্রান্ত বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে তার পর্বতাকার বিস্ময়। দুই চোখে অহৈতুক আশঙ্কার বিবর্ণতা।

ধরণীবাবু ধম্‌কে উঠলেন: তোর শ্বশুরমশাই যে!

আঁচলের প্রান্তটা মাথায় কোনোরকমে টেনে দিয়ে প্রাণহীন, যান্ত্রিক একটা ভঙ্গিতে ললিতা জগদীশবাবুর পায়ের কাছে প্রণত হলো। সে প্রণাম সাঙ্গ হবার আগেই জগদীশবাবু তাঁর প্রসারিত, পেশল দুই হাতে ললিতাকে বুকের উপর টেনে নিলেন। পায়ের নরম, শিথিল ক'টি আঙুলের ঈষৎ কম্পিত একটি ছোঁয়ায় তাঁর দু' চোখে অনর্গল জল নেমে এলো। ললিতার সদ্যসিক্ত চুলের উপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন—তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি, মা। তোমাকে ছাড়া ঘর-দোর আমার সব আঁধার হয়ে আছে। আমি কেবল পাতাবাহারেরই বাগান করেছি, মা, কোথাও আমার ফুল ফুটে নেই।

আস্তে-আস্তে সেই আলিঙ্গন থেকে নিজেকে শিথিল করে এনে ললিতা শ্বশুরের দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলো।

চেয়ারে পিঠ ছড়িয়ে বসে জগদীশবাবু দরাজ, প্রফুল্ল গলায় বললেন,—আজ বিকেলের ট্রেনেই আমরা যাবো, মা। দিন পাঁচেক পরে লক্ষ্মীর বিয়ে। কিন্তু ঘরের লক্ষ্মীই যদি পরবাসী থাকে, আমার উৎসব তবে জমবে কী করে বলো?

ললিতা ততোক্ষণে জানলার কাছে সরে গেছে। মুঠো করে লোহার একটা শিক চেপে ধরে বললে,—ও! লক্ষ্মীর বিয়ে নাকি?

—হ্যাঁ, এই সতোরোই। নিশ্বাস ফেলবারো আমার সময় নেই। জগদীশবাবু স্বচ্ছন্দে জামার বোতাম খুলতে-খুলতে বললেন,—তবু সবাইকে ঠেলে ফেলে আমিই ছুটে এলাম, মা। সবার আগে আমিই

মা-কে দেখবো—আমিই নিয়ে যাবো মা-কে উদ্ধার করে। জগদীশবাবু অপর্যাপ্ত খুশিতে অনর্গল হেসে উঠলেন: অতো দূরে গিয়ে দাঁড়ালে কেন, আমার কাছে এসো, বুড়ো ছেলেকে একটু আদর করো এসে।

জগদীশবাবুর উচ্ছ্বসিত হাসির উপর ললিতার মুখ প্রলয়ের অন্ধকারে হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো। স্পষ্টতায় তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন গলায় সে বললে,—আমি যেতে পারবো না।

কথাটা রূঢ়তায় এতো অনাবৃত যে তার জ্বালায় ধরণীবাবুর সর্বাঙ্গ যেন ঝলসে গেলো। বরং তাঁর আশা ছিলো—জগদীশবাবুকে পেয়ে ললিতার উড্ডীন দুই বিস্ফারিত পাখা এবার ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয় দেখতে পাবে। প্রণামের ভঙ্গিতে তার বিদ্রোহের শাণিত রেখাগুলি শীতল, ম্রিয়মাণ হয়ে আসবে বা। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঔদ্ধত্যে তাঁর সমস্ত সাধ-স্বপ্ন যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো। ললিতার মুখের উপর তিনি ফেটে পড়লেন: যেতে পারবি নে মানে? তোর ননদের বিয়ে—বাড়ির বৌ হয়ে—

ললিতার পান-খাওয়া টুকটুকে দুটি ঠোঁটে বিশীর্ণ একটি হাসি ফুটে উঠলো: তার আমি কী করবো? এখান থেকে তার জন্যে শুভকামনা করলেই আমার যথেষ্ট।

ধরণীবাবু গোড়ায় যদি বা একটু সবিনয় আপত্তি করছিলেন, এখন একেবারে সুর ধরলেন উলটো। দুটো দিন ধরে রাখা দূরের কথা, এখন ললিতাকে ঠেলে বাড়ির বার করে দিতে পারলেই যেন তিনি বাঁচেন। ঝাঁজালো গলায় তিনি বললেন,—তোর যেতে না-পারার কী কারণ থাকতে পারে? এখানে তোর কী কাজ?

—কাজ অনেক। কথাগুলি ললিতার নিজের কাছেই কেমন নির্লজ্জ, অশোভন শোনাচ্ছিলো, কিন্তু অন্তত সত্যের কাছে সে মুখে ঘোমটা টেনে দাঁড়াতে পারবে না: সামনেই আমার পরীক্ষা, আর

ছুটি মাসও তার বাকি নেই। এখন একটি দিনও বাজে কাজে ব্যয় করার মতো আমার সময় নেই, বাবা।

—এটা একটা বাজে কাজ হলো? জগদীশবাবুর নীরব, বিমূঢ় উপস্থিতিটা তাঁর রাগে যেন ধীরে-ধীরে হাওয়া দিতে সুরু করেছে। ধরণীবাবু অস্থির হয়ে বললেন,—তোদের সংসারে বিয়ে, তোর আপন ননদ, আর তুই সেখানে যাবি নে? এ কখনো হতে পারে? এর কাছে কী ছাই তোর পরীক্ষা!

ললিতা চোখ নামিয়ে অস্ফুট গলায় বললে,—কোথায় কার সংসার, বাবা!

দুঃখের মধ্যে দু'টো অংশ আছে—এক আঘাত, অপর বেদনা। সেই বেদনাহীন নির্দয় আঘাতটা অতিকায় একটা বিস্ময়ের মতো জগদীশবাবুকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেললো। সমস্ত ব্যাপারটা যেন তিনি আনুপূর্বিক অনুধাবন করতে পারছেন না : এ যেন সেই ললিতা নয়। সেই নির্বাক্‌কুণ্ঠিতা, প্রচ্ছন্নচারিণী ললিতা! সে যেন আর নয় সেই সান্ধ্য, স্তিমিত দীপশিখা—নির্বারিত, নিষ্কাশিত একটা অসি। আগে তার শরীরে ক্লেশশীর্ণ, অনির্বচনীয় একটি কৃশতা ছিলো, এখন তার দেহ রূপে-রেখায় বন্য, প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে। দু'-চোখের দীর্ঘ, আনমিত দুই পল্লব আগে তার কপোলের উপর স্নিগ্ধ একটি ছায়া বিস্তার করতো, এখন তার বিস্তৃত, উদার দৃষ্টিতে যেন প্রখর উলঙ্গতা! তার দিকে তেমন কোমল স্নেহে যেন আর চাওয়া যায় না। ললাটে উদ্ধত দীপ্তি, সমস্ত মুখাভাসে একটা স্থূল, সচেতন গাম্ভীর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লাস্যলীলায় যেন কোন লালসা রয়েছে প্রচ্ছন্ন। রৌদ্রদগ্ধ, শুভ্র আকাশে কোথাও যেন একটি সৌম্যকান্ত নীলিমার চিহ্ন নেই। আগে তার চারপাশে বেদনার করুণ, ঘন একটি কুজ্ঝটিকা ছিলো—হয়তো সেই ছিলো তার প্রকাশের সুষমা। ছবিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে তার আলোর পাশে আজ যেন আর এক কণা নিরাবরণ ছায়া নেই। বিলাস-সমৃদ্ধির মাঝে

নিজেকে এই তার গৌরবদানের চেষ্টাটা জগদীশবাবুর কাছে মর্মান্তিক কুৎসিত লাগছিলো। আজো তাকে সেই প্রতীক্ষমানা, বিষণ্ণ বিরহিণীর বেশে দেখতে পেলেই বোধহয় তিনি খুসি হতেন। কিন্তু তার সেই শ্যামল গ্রাম্যতার উপর আজ রুক্ষ নগরীর প্রখর চাকচিক্য এসে পড়েছে।

জগদীশবাবু গলায় খানিকক্ষণ কোনো কথা পেলেন না। শুকনো একটা ঢোঁক গিলে তিনি শূন্য, নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জিগগেস করলেন : সংসারে সেই একজনই কি তোমার সব? আমরা কি তোমার কেউ নই?

—এ-সব কথার আমি কী উত্তর দেবো বলুন! তার মুখে এক নিমেষে এতো কথা যে আজ কোত্থেকে অনর্গল এসে যাচ্ছে, ললিতা নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। জানালার শিকটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে, কী বলছে কিছু আয়ত্ত না করেই সে স্পষ্ট বলে ফেললো : কিন্তু আমার ওপর ঐ সংসারের আর কোনো দাবি নেই।

—দাবি নেই? অপরাধীর মতো নিরুত্তেজ, ম্লান গলায় জগদীশ-বাবু বললেন,—বৃথা তুমি অভিমান করছ, মা। একজনের ভেতর দিয়ে তোমার পরিবার কতো বৃহৎ হয়ে উঠেছে একদিনে, তোমার দুয়ারে স্নেহানুরক্ত কতো প্রত্যাশী জুটেছে একে-একে, তাদের তুমি ত্যাগ করবে কী করে? তোমার সেই লক্ষ্মী, তোমার এই বুড়ো অনাথ ছেলে! দাবি নেই—এমন নিষ্ঠুর কথা তুমি বললে কী করে, বৌমা?

ললিতা আঙুলে আঁচল জড়াতে-জড়াতে নম্রকণ্ঠে বললে,—কিন্তু সেই সব সম্পর্ক তো চুকে গেছে। মাটি থেকে যে-গাছ মূলচ্যুত হয়ে গেছে, তার কাছ থেকে ছায়া আশা করা ভুল।

—অনেক কথা যে শিখেছিস দেখছি। চাপা রাগে ধরণীবাবু মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।

মূলচ্যুত তো তুমি হও নি, বৌমা। উত্তেজনায় জগদীশবাবু চেয়ারের মধ্যে নড়ে-চড়ে উঠলেন : আমরা যে তোমাকে সহস্র শিকড় মেলে আঁকড়ে ধরে আছি।

—প্রাণহীন শুকনো একটা কাঠকে জোর করে ধরে রেখে লাভ কী? আমাকে ছেড়ে দিন।

ক্ষণকাল জগদীশবাবু স্তম্ভিতের মতো বসে রইলেন। একটার পর একটা তাঁর জামার ঘরগুলি বোতামে ভরে উঠতে লাগলো। চেয়ারের হাতলটা দৃঢ় হাতে চেপে ধরে তিনি আর্ত, রুক্ষ গলায় বললেন,—ছেলের কখনো মৃত্যুকামনা করি না, কিন্তু সেই সর্বনাশটাও যদি কোনোদিন ঘটে, তবু, তবু বৌমা, তোমার স্থান চিরকাল আমাদেরই সেই সংসারে। তোমার ওপর তারই দাবি সকলের আগে।

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই ললিতা বলে উঠল : কিন্তু এ-ঘটনাটা সেই মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক।

ধরণীবাবু ফের একটা গর্জ্জন করে উঠলেন : এ-সব তুই কী বলছিস, ললিতা?

ললিতা চোখ নামিয়ে ভীত, পাংশু মুখে বললে—জানিনা কী বলছি। তবে এই কথাটাই হয়তো বোঝাতে চাচ্ছি, বাবা, আমার ওপর সংসারে আর কারুর কোনো দাবি-দাওয়া নেই, আমিও কারুর আর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না।

কথাটা বলে ফেলেই ললিতা চলে যাচ্ছিলো, ধরণীবাবু তার পথরোধ করে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর ঠোঁট দু'টো থরথর করে কাঁপছে, হাতে-পায়ে যেন আর তাঁর কোনো বশ নেই।

—ওঁদের ঘরে তোর বিয়ে হয় নি?

—হয়েছিলো. দুঃস্বপ্নের মতো আমার তা স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সেইটেই আমার পরিচয়ের শেষ কথা নয়, বাবা।

—বৃথা ওর সঙ্গে তর্ক করছেন আপনি। জগদীশবাবু চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গায়ের চাদরটা কাঁধের উপর ভাঁজ করতে-করতে বললেন—আমি চললাম।

ললিতাই এগিয়ে এলো: সে কী কথা? এখুনি যাবেন কোথায়?

—নিশ্চয়। এখানে থাকবোই বা কী করতে? আমি তো তোমার কেউ নই।

ললিতা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে,—কেউ না-ই বা হলেন। তবু বাড়িতে অতিথি এসেছেন তো। তাঁর তো প্রাপ্য একটা সেবা আছে।

—থাক্। সেবার কথা বলে এই বুড়োকে আর অপমান কোরো না!

—অপমান! ললিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—তোমাদের হালি ভাষায় একেই বোধহয় সেবা বলে। প্রচ্ছন্ন রোষে ও ক্ষোভে জগদীশবাবুর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে: কিন্তু এই বুড়ো বয়সে এতোটা পথ ট্রেন-স্টিমারের ধকল সয়ে এসে ফের শুধু-হাতে এমনি ফিরে যাওটাকে আমরা ঠিক আপ্যায়ন বলি না। কিন্তু সম্পর্ক যখন চুকে গেছেই বলছ, যাক।

ললিতা স্নিগ্ধ গলায় বললে,—আমাকে নিয়ে গেলেও আপনার সেই ফিরে যাওয়াই হতো, বাবা। কিন্তু আমাকে তো আমি বেঁচে থাকতে অপমানিত হতে দিতে পারি না।

—বেশ, বেঁচেই থাকো তবে। জগদীশ কুটিল একটা ভ্রূভঙ্গি করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে ধরণীবাবু তাঁর পথ আগ্‌লালেন: বা, এখুনি আপনি যাচ্ছেন কোথায়? আপনাদের ট্রেন তো সেই বিকেলে।

জগদীশবাবু বললেন—যাওয়া কেবল মানুষের ট্রেনেই হয় না বেয়াই মশাই, কখনো-কখনো মানুষ পায়ে হেঁটেও চলে যেতে পারে।

ব্যাপারটা অকস্মাৎ ললিতার কাছে অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন, বীভৎস বলে মনে হতে লাগলো। এতোদিনকার মনের রুদ্ধ আক্রোশটা হঠাৎ একটা নির্গমনের পথ পেয়ে নিদারুণ কলুষিত হয়ে দেখা

দিয়েছে। তাতে কোনো শ্রী নেই, কোনো সংযম সে রক্ষা করতে পারে নি। বিনয়ে ভেঙে পড়ে ললিতা জগদীশবাবুর কাছ ঘেঁসে এলো ; করুণ, মিনতিময় কণ্ঠে বললে,—আপনি যাবেন না। আমি আপনার কাছে অনেক অপরাধ করেছি, কিন্তু বাবার কোনে দোষ নেই।

জগদীশবাবু বললেন,—তেমনি মহীই তোমার কাছে দোষ করেছিলো, আমার কোনো দোষ ছিলো না, ললিতা।

এ-কথার যে কী সদুত্তর দেয়া যেতে পারে ললিতার কিছু মনে এলো না।

জগদীশবাবুই কথাটার জের টানলেন : সম্পর্কটা একটা পারস্পরিক ঘটনা। তোমার যখন আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, অতএব আমাদেরো নেই। একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে জগদীশবাবু ফের বললেন—শুনে সুখী হলাম, সংসারে স্বামীকেই তুমি চিনেছিলে। কিন্তু তোমার সীমন্তে স্মৃতির সেই চিহ্নটুকুও দেখছি বাঁচিয়ে রাখো নি। বোধহয় তাকেও তুমি আর স্বীকার করতে চাও না!

ললিতা কোনো আর কথা বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে কে যেন তাকে ঠেলা মারতে লাগলো। অসহায়ের মতো সে বলে বসলো : যিনি আমাকে কোনদিন স্বীকার করলেন না, তাঁর প্রতি আমার নিস্পৃহতাটা কি খুবই অন্যায় বাবা?

—তোমার সঙ্গে তর্কে কে এঁটে উঠবে বলো? তুমি যে নতুন পরীক্ষা দিচ্ছ। জগদীশবাবু তার মুখের উপর বিদ্রূপের একটা তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে দ্বিধা করলেন না। ললিতার মাঝে তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর ছেলের অপমৃত্যু। মনে মনে প্রবল একটা প্রলোভন ছিল যে, হয়তো দেখতে পাবেন ললিতার চারপাশে বিরহের নিভৃত পরিমণ্ডলের মাঝে মহীপতি এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু নিস্ফল, নিরাবরণ মরুভূমিতে আশ্রয়-শীতল এক কণা ছায়া তিনি খুঁজে পেলেন না। চৌকাঠটা পেরোবার আগে মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন : কিন্তু কিসে তোমার এতো বড় আস্পর্দ্ধা হলো সেই কথা ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি, ললিতা। তুমি কি এর পরেও মহীর পথ চেয়ে বসে থাকতে চাও নাকি ?

ললিতা এবারো না বলে থাকতে পারলো না : পৃথিবীতে নিজের পথ পেলেই আমি বাঁচবো।

—ও ! হ্যাঁ, জিগগেস করাটাই আমার ভুল হয়েছিলো। আচ্ছা, বেশ। জগদীশবাবু রেখাহীন, গম্ভীর মুখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হাঁক পাড়লেন : হরেন ! হরেন ! ট্যাক্সিটাকে এরি মধ্যে বিদেয় করে দিয়েছ নাকি ? ডাকো, ডাকো, ফের একটা ধরে নিয়ে এসো, এখুনি আমাদের ফিরে যেতে হবে।

ধরণীবাবু অনুনয়ে আলুণ্ঠিত হতে লাগলেন, জগদীশবাবুকে কিছুতেই ফেরানো গেলো না। রাস্তায় নেমে এসে তিনি কঠিন মুখ করে বললেন,—যতোক্ষণ আপনার বাড়ির মধ্যে ছিলাম ততোক্ষণ যা-হোক আপনার সঙ্গে একটা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিলো, কিন্তু আর কেন, সে-বাড়ি থেকে তো আমি বেরিয়ে এসেছি। রাস্তায় চলে এসে এখন আমার মনে পড়ছে যে আমি পিরগাঁয়ের জমিদার। সে-কথা আমি আর ভুলতে চাই না, ধরণীবাবু।

উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে ললিতা সমস্ত দৃশ্যটা আগাগোড়ো দেখছে, পিছনের চাকায় ধুলো উড়িয়ে তার চোখের উপর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিটাও রাস্তার মোড় ঘুরলো। কোথা থেকে কী যে একটা কাণ্ড ঘটে গেলো তার কিছুই যেন সে ধরতে-ছুঁতে পেলো না ; মনে হলো তার জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন এক নিমেষে ভারমুক্ত এই প্রভাতবেলাটির মতো সাদা, পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

ধরণীবাবু ক্ষিপ্তের মতো উপরে ছুটে এসে প্রায় একটা চীৎকার করে উঠলেন : এ তুই কি করলি, লিলি ? এমন একজন গণ্যমান্য অতিথি, তোর এতো বড়ো একজন গুরুজন—তাকে তুই এক কথায় এমনি তাড়িয়ে দিলি ?

ললিতা এমনি একটা রূঢ় ভর্ৎসনার জন্যে মনে-মনে প্রস্তুত হয়েই ছিলো, ব্যথিত নম্রতায় গলে গিয়ে বললে—এতে আমার কী করবার আছে বলো? আমি তাঁর সঙ্গে তাঁদের সংসারে ফিরে যেতে পারি না, সেটা কি আমার অপরাধ, বাবা?

—যেতে পারিস না, কেন তুই যেতে পারবি না শুনি?

ললিতা জানলার বাইরে উদাসীন দৃষ্টি মেলে বললে,—এই প্রশ্নটা আমাকে না জিগগেস করলেও পারতে।

—কিন্তু এরা কি তোর কেউ নয়? ধরনীবাবু আরেকটা হুঙ্কার দিলেন।

—কেউই আমার কিছু নয়, বাবা। বলো, আমার আর কে আছে আমার শুধু এই আমি ছাড়া, একলা আমি। ললিতা জানলা থেকে সরে তার টেবিলে এসে বসলো।

ধরণীবাবু তার কাছে এগিয়ে এলেন: তুই ভেবেছিস কী? হিন্দুর মেয়ে হয়ে বিবাহের এই দৈব সম্বন্ধটা তুই ছিন্ন করবি কি করে?

ললিতা একটা বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললে,—সেই তো হিন্দুমেয়ের দুর্ভাগ্য, বাবা। একবার এই বিয়ের জালে জড়িয়ে গেলে আর তার মুক্তি নেই, বন্ধনটা যতো বেদনার, যতো অত্যাচারেরই হোক না কেন, তিল-তিল করে তাকে আমরণ মরতেই হবে। কিন্তু আমার আর ভাবনা কী বলো, ললিতা দুই ঠোঁটের বিষণ্ণ রেখায় হেসে উঠলো: আমি তো মুক্তি পেয়েই গেছি দেখছো।

—কিন্তু মহীপতি যদি একদিন আসে?

ললিতার দুই চোখ যেন অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠলো: তিনি আবার কেন আসতে যাবেন? তিনি তো সন্ন্যাসী।

—ধর, যদি সে একদিন আসে। ধরণীবাবুর দৃষ্টি প্রতিহিংসায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে: আর এসে যদি তোকে নিয়ে যেতে চায়?

—তার আস্পর্দ্ধাকে বলিহারি। ললিতা টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো: তাকে হয়তো আবার এমনি অধোমুখে ফিরে যেতে হবে।

॥ বারো ॥

সমস্ত সংসারে বিশ্রী একটা গুমোট করে এলো।

ধরণীবাবুর মাঝে পিতৃস্নেহের সেই উদার প্রশান্তি আর দেখা গেলো না। তিনি কিছুতেই পারলেন না প্রশ্রয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে। অন্ধকারের মৃত একটা ভারের মতো ললিতার উপস্থিতিটা যেন তাঁর বুক চেপে ধরেছে। একটা শূন্য, প্রেতায়িত উপস্থিতি।

প্রথম তিনি মেয়েকে অনেক বোঝাতে গেলেন, আর্দ্র স্নিগ্ধতায়, অবারিত ঔদার্য্যে। পরে দেখালেন ভয়, দুর্নামের ভয়, দুর্গতির ভয়, তার মুক্তির বিশাল অসহায়তার ভয়। তবু ললিতা তার অভ্রভেদিতা থেকে এক তিল নেমে এলো না।

ধরণীবাবু উঠলেন অবশেষে বিষাক্ত হয়ে। কঠিন, কটু কণ্ঠে বললেন,—তবে তুই কি করবি ভেবেছিস? কে তোর ভার বইবে সারা জীবন?

ললিতা বিবর্ণ মুখে হাসলো। বললে,—সে ভার আমি নিজেই বইতে পারবো, বাবা। আর ক'টা দিন আমাকে আশ্রয় দাও, পরে আমিই আমার একটা পথ করতে পারবো।

—পথ করতে পারবি? ধরণীবাবু গর্জ্জন করে উঠলেন: কিন্তু কী পথ আর তোর আছে?

—প্রাণহীন কতোগুলি বিধিবিধানের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের সমস্ত পথ ফুরিয়ে যায় নি হয়তো। ললিতা কাতর, শুকনো গলায় বললে,—আমার পথও আমাকে খুঁজে নিতে হবে। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।

কিন্তু, ধরণীবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন: পাগলের মতো এ-সব

তুই কী বলছিস, লিলি? ভাববো না তো বটেই, তুই যদি আবার ফিরে যাস তোর শ্বশুর-বাড়ি, তোর নিজের জায়গায়।

—আমার যাবার জায়গা কোথায় তা আমি নিজেই ভালো জানি। ললিতা কালো মেঘে কুটিল ইঙ্গিত করে বিশীর্ণ একটা বিদ্যুৎ-রেখার মতো গেলো মিলিয়ে।

ধরণীবাবু সৌরাংশুর শরণাপন্ন হলেন। তার উপর তিনি ভারি সদয়, ভারি প্রসন্ন। তার স্বভাবে এমন একটি মধুর পরিচ্ছন্নতা আছে, এমন একটি নির্লিপ্ত প্রশান্ততা, যে তাকে তিনি শুধু সম্মান করতেন না, বিশ্বাস করতেন। তাকে কাছে ডেকে এনে তিনি বললেন,—তুমি ওকে তবে কিছু বুঝিয়ে বলতে পারো?

সমস্যাটা সৌরাংশু সত্যের সাদা আলোয় জীবনের একটা বিষয় বলেই যেন দেখছিলো, বিশেষ কোনো ব্যক্তির থেকে অসম্পৃক্ত করে; তাই সে কুণ্ঠিত গলায় বললে, বলে কিছু বোঝাবার আছে বলে তো আমার মনে হয় না। এখন ওঁর মাঝে প্রবল একটা প্রতিক্রিয়ার সুর এসেছে; সময়ের আঘাতে আবার তা হয়তো একদিন জুড়িয়ে আসবে। ততোদিন একটু প্রতীক্ষা করতে হবে বৈকি।

—সে কতোদিন, তা কে বলতে পারে?

—তবু মিছিমিছি এ নিয়ে জোর খাটাতে গেলে প্রতিপক্ষের মাঝেও অকারণে একটা জোর এনে দেওয়া হবে। সৌরাংশু স্নিগ্ধ গলায় বললে,—তাতে ফল দাঁড়াবে উলটো। সময়ের হাতেই ছেড়ে দেয়া ভালো, আমরা সবাই এক অর্থে সময়ের হাতেই নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি।

ধরণীবাবু যেন সান্ত্বনায় ভরে উঠলেন। বললেন—তুমিই পারবে, সৌরাংশু। তুমি ওকে বললেই ও তোমার কথা শুনবে। আমি জানি, ও তোমাকে খুব মান্য করে। তুমি চেষ্টা করলেই ওকে ওর শ্বশুর-বাড়ি রেখে আসতে পারো।

সৌরাংশু হাসলো। বললে,—কিন্তু ওঁকে ওখানে রেখে আসবারই বা কী মানে আছে? সত্যিই তো সেখানে ওঁর কিসের আশ্রয়, কিসের আকর্ষণ?

—কিন্তু শেষকালে ওর শ্বশুরো ওকে ত্যাগ করবে নাকি?

—যিনি ওঁকে ত্যাগ করেছেন তাঁর ত্যাগের চেয়ে তো আর এ বেশি কঠিন নয়। সৌরাংশু ক্লান্ত গলায় বললে,—তাঁকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করুন, দেখবেন তা হলেই আবার তাঁর সঙ্গে সমস্ত ঘর-বাড়ি ভরে উঠেছে।

—সে নিজে থেকে ফিরে না এলে আর কী করা যাবে বলো?

—তেমনি উনি নিজে থেকে সেখানে না গেলেই আমরাই বা কী করতে পারি?

—কিন্তু তার একটা কর্তব্য আছে তো?

—তেমনি মহীপতিবাবুরো তো একটা কর্তব্য ছিলো।

ধরণীবাবু বলবার আর কিছু কথা পেলেন না। নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ললিতার উপর ভীষণ অবিচার করা হয়েছে, চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোরতরো অপমানের বোঝা, চিরন্তন একটা ব্যর্থতার গ্লানি, তবু, শত সমব্যথমান মমতা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না তার এই উদ্ধত একাকীত্ব। অহিষ্ণু গলায় বললেন,—কিন্তু যতদিন মহীপতি না ফেরে, ততোদিন তো ও শ্বশুরবাড়িতে বসেও প্রতীক্ষা করতে পারে। তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দেবার কী মানে আছে?

—কিন্তু মহীপতিবাবু যদি একেবারেই না ফেরেন? তাঁর ফিরে আসবার তো কোন গ্যারাণ্টি নেই।

—না-ই যদি ফেরে, কী আর করা যাবে? হিন্দু-বিধবারা আর তাদের স্বামীর সংসারে টিঁকে থাকে না?

—তুলনাটা কোনো দিক দিয়েই ঠিক হলো না বোধ হয়। সৌরাংশু বিনীত হয়ে বললে,—প্রথমতো ওঁর স্বামী বর্তমান,

দ্বিতীয়তো সবটাই কেউ আমরা হিন্দু নই। কোনো একটা ধর্মমতের চেয়েও মানুষের বিবেক হয়তো বড়ো জিনিস, মানুষের আত্মসম্মান। হিন্দুত্বের ঋণ শুধতে গিয়ে মনুষ্যত্বে খাটো হওয়াটা কারু-কারু কাছে খুব বেশি কামনীয় না-ও হতে পারে।

—তা হলে তুমি বলছ স্বামী ও সংসার ছেড়ে লিলি এমনি একটা বিদ্রোহের তুফান তুলে দেবে? ধরণীবাবুর গলা তিক্ততায় প্রখর হয়ে এলো।

—আমি কিছুই বলছি না। আমার বলবার কী-ই বা অধিকার আছে! সৌরাংশু তার মুখের স্বাভাবিক, সতেজ প্রফুল্লতায় বললে, —আমি শুধু ওঁর চিন্তাগুলিকে অনুসরণ করছি। বিদ্রোহটা কোনো কাজের কথা নয়, তাতে শক্তি নেই, সুষমা নেই। নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার সাময়িক একটা বিকার ছাড়া সেটা কিছু নয়। এই বেলাও তাই ঘটেছে। তাকে দিন স্বামী, দিন ফিরিয়ে তার সংসার, সমস্ত বিদ্রোহ উপলব্ধিতে আবার দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে।

ধরণীবাবু ক্লান্ত, অসহায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,— সব, সব আমি বুঝি, সৌরাংশু। কিন্তু কোত্থেকে তাকে কী ফিরিয়ে দেবো বলো?

সৌরাংশু জিগগেস করলে: কেন, মহীপতিবাবুর কী কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না?

—যাচ্ছে বৈ কি, ধরণীবাবু নিরাশ, নিরানন্দ মুখে বললেন,— জগদীশবাবু তো তার গতিবিধি নজরে রাখছেন শুনছি। কতো চিঠি, কতো অনুরোধ, তবু তার ফেরবার নাম নেই। ফিরবে কি না তাই বা কে জানে?

—যদি স্বামীই না ফেরেন, তবে স্ত্রীকেই বা আপনি কী কয়ে জোর করে ফিরিয়ে দিতে পারেন? স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীও তো সন্ন্যাসিনী হয়ে উঠতে পারে।

—তোমাদের এই আধুনিকতার ঝাঁজ আমি সইতে পারি না,

সৌরাংশু! ধরণীবাবু ছটফট করে উঠলেন : কিন্তু ধরো, যদি একদিন মহীপতি ফেরে?

সৌরাংশু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো : তা হলে তো কথাই নেই। আমরা তো সবাই সেই পথ চেয়েই বসে আছি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

—কী

—মহীপতিবাবুর বর্তমান ঠিকানাটা সংগ্রহ করুন।

—তারপর? ধরণীবাবু যেন সমুদ্রের কূল দেখতে পাচ্ছেন।

—তারপর চলুন, ললিতাকে সেখানে আমরা রেখে আসি। ললিতা গেলে হয়তো তাঁকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।

ধরণীবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : কিন্তু লিলি সেখানে যাবে মনে করো?

—কেনই বা যাবেন না? তিনি শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন তাঁর স্বামীর কাছে। সৌরাংশু প্রশান্ত গলায় বললে,—সেদিক থেকে তো চেষ্টা করে কখনো দেখা হয় নি, দেখুন না একবার।

ধরণীবাবু তার হাত চেপে ধরলেন : তুমি তা হলে তার মত করাও, সৌরাংশু। আমি জগদীশবাবুকে লিখে মহীপতির ঠিকানা আনাচ্ছি। তারপর চলো, সবাই মিলে একবার ভেসে পড়ি। ললিতা গিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই সে আর কঠিন থাকতে পারবে না, নিশ্চয়। এতোদিনে তার সেই স্বপ্ন হয়তো ভেঙ্গে গেছে। তাই, তাই,—এখন তার ঠিকানাটা পেলে হয়।

॥ তেরো ॥

ললিতা সন্ধ্যার অন্ধকারে সাদা, অশরীরী একটা ছায়ার মতো বসে ছিলো। যেন আকাশের কোণে জলহীন, অবাস্তব একটা মেঘ।

সৌরাংশু আস্তে-আস্তে দরজার ওপারে এসে দাঁড়ালো। থমকে গেলো ললিতার বসবার এই শীতল ঔদাস্য দেখে। তার মলিন আলস্যে পুঞ্জিত হয়ে আছে যেন ব্যর্থতার ভার, দিনের দগ্ধতার শেষে সন্ধ্যায় এই নিরাভ ধূসরতা।

দিনের বেলায় ললিতাকে আরেক মূর্তিতে দেখা গিয়েছিলো, রৌদ্রে ঝলসে-ওঠা তলোয়ালের তীব্রতার মতো। এখন সন্ধ্যার এই মন্থর ঘনায়মানতায় তার বসবার ভঙ্গিটি যেন বিষণ্ণ একটি সুরের মতো করুণ ক্লান্তিতে ভিজে উঠেছে। ঘরে নিঃশব্দতার কতোগুলি প্রেত যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেয়ালগুলি যেন স্পর্শহীন শূন্যতা দিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে যেন আর সময় নেই, স্রোত নেই, সব একটি অবিচল, অবাস্তব স্তব্ধতা।

ঘরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে সুইচ পেয়ে সৌরাংশু তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দিলো।

ললিতা উঠলো একটা সাপের মতো চমকিত হয়ে। বললে,—কে?

সৌরাংশু এক পা এগিয়ে এসে বললে,—সুমনা কি আজো আসে নি? তা হলে কাজটা ছেড়েই দিলো একেবারে?

—সুমনা-দি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন কিনা তা তো আপনিই ভালো জানেন। তার জন্যে মিছিমিছি কষ্ট করে আমাকে জিগগেস করতে এসেছেন কেন? ললিতা বিরক্ত মুখে বললে।

—কিন্তু আপনাকে সেইটেই আমার একমাত্র প্রশ্ন ছিলো না। সৌরাংশু নিঃসংশয় সপ্রতিভতায় দূরে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো : আপনার সঙ্গে আমার যে আরো অনেক কথা আছে। গভীর কথা।

ললিতার যে কেমন করে উঠলো বলা কঠিন। শূন্য চোখে সৌরাংশুর দিকে চেয়ে থেকে একটু বা ভীত, সন্দিগ্ধ গলায় বললে,—বলুন। আমার সঙ্গে পৃথিবীতে কারু কোনো কথা থাকতে পারে বলে আমার জানা ছিলো না।

—কিন্তু খুব একটা আনন্দেরো কথা যে। সৌরাংশু হেসে উঠে ঘরের আবহাওয়াটাকে তরল করে আনলো। বললে,—তাই তো আলো জ্বালালাম, আলো না থাকলে সেই আনন্দকে যে স্পষ্ট করে দেখা যাবে না।

বৃষ্টির আগেকার মুহূর্তে বিবর্ণ মৃত্তিকার মতো ললিতা প্রতীক্ষায় কঠিন হয়ে রইলো।

সৌরাংশু কী যে কথা বলতে এসেছে, সংসারে কোন কথাটা যে তার পক্ষে মর্মান্তিক সুখকর, ললিতা সেই মুহূর্তে কিছু ভেবে পেলো না। বিমূঢ়, বিহ্বল চোখে তাকালো একবার সৌরাংশুর মুখের দিকে, তার বলদৃপ্ত প্রফুল্লতার দিকে। তার উপস্থিতির ত্বরান্বিত প্রখরতায় সে দীপ্তি পাচ্ছে। এখুনি যেন সে ললিতার অবসাদের আকাশে সেই আনন্দময় শুভ সংবাদ দেবে বিকীর্ণ করে, রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের মতো—কী না-জানি সেই শুভ সংবাদ! জিজ্ঞাসা করতে পর্যন্ত ললিতার সাহস হলো না। বিমুগ্ধ ভয়ে সে অনিমেষে চেয়ে রইলো।

সবল সপৌরুষে সৌরাংশু বললে,—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?

প্রশ্নটার দুঃসহ তীব্রতায় ললিতার দুই চোখ যেন হঠাৎ ধাঁধিয়ে গেলো। শরীরের অন্ধকারে উঠলো সে মর্মরিত হয়ে। শিহরিত

দীর্ঘতায় একটি কম্পান্বিত আভা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত প্রতীক্ষা করলো না, দ্বিধা করলো না। সৌরাংশুর কণ্ঠস্বরে সমস্ত বাহির যেন তাকে ডাক দিয়ে উঠেছে—সেই বহুদূর মেরু-পথ, নীল-নির্জন সমুদ্র। বিহ্বল গলায়, আত্মবিস্মৃতের মতো বললে,—সত্যি যাবো। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।

সৌরাংশুর মুখ যেন হঠাৎ এক ফুঁয়ে গেলো নিবে। থতিয়ে, শুকনো গলায় বললে,—কোথায় যাবেন বলুন তো?

—তা কী জানি? যেখানে হোক, যেখানে আপনার খুসি। পরিচিত এই পরিধির বাইরে। ললিতা নির্ধূম একটা শিখার মতো আবার উঠলো কেঁপে।

সৌরাংশু ঘেমে উঠলো। আমতা-আমতা করে বললে,—তেমন যাওয়ার কথা তো কিছু বলি নি।

—তবে আমাকে এমনি হাওয়া বদল করিয়ে আনতে চান নাকি? ললিতা হেসে উঠলো। কঙ্কালায়িত, নিরবয়ব সেই হাসি।

—প্রায় তাই। সৌরাংশু সেই হাসিতে যেন একটা স্বস্তির আভাস পেলো, সেই হাসিতে যেন উড়ে গেলো তার কথার জড়িমা, দৃষ্টির কুণ্ঠিত কুজ্ঝটিকা: আপনাকে আপনার স্বামীর কাছে নিয়ে যাবার কথা বলতে এসেছিলাম।

—কার কাছে?

—মহীপতিবাবুর কাছে। সৌরাংশু ঢোঁক গিলে বললে,—তাঁর নতুন ঠিকানা পাওয়া গেছে।

ললিতা একমুহূর্ত কোনো কথা কইল না। স্খলিত পায়ে আস্তে-আস্তে সরে গিয়ে জানালার কাছে বসলো, যেখানে এই রূঢ় আলো বেদনায় নরম হয়ে এসেছে, যেখান থেকে অস্পষ্ট করে দেখা যায় পৃথিবীর ধূসর বিশালতা।

ললিতার স্বরটা শোনা গেলো করুণ আর্তনাদের মতো: ঠিকানা পাওয়া গেছে, তবে আমাকে এখন কী করতে হবে?

—যদি বলেন, সৌরাংশু সৌজন্যে প্রসারিত হলো : আমি আর আপনার বাবা আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

—আমার উপর আপনাদের এতো দয়া হবার কারণ? ললিতার চোখ অন্ধকারে বন্দী পশুর চোখের মতো অসহায় বন্যতায় উঠলো জ্বলে।

—দয়ার কথা নয়, সৌরাংশু নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—আপনার বাবা বলছিলেন কিনা, তাই।

—ও, আপনি কিছু বলছেন না? ললিতা ফের আলোয় উঠে এলো। বসলো পাশের একটা চেয়ারে। বললে,—তবু, আপনি ভাবতে পাচ্ছেন আমি সেখানে যাবো, আমি?

—গেলেনই বা। সৌরাংশু শান্ত গলায় বললে,—আপনার স্বামীর কাছেই তো যাচ্ছেন।

—আমি যাবো তার কাছে ভিক্ষা করতে, তার কাছে, যে আমাকে একদিন—কথাটা ললিতা শেষ করতে পারলো না। একটা অন্ধ রাগে, কঠিন অশ্রুহীনতায় তার মুখ পীড়িত, বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

সৌরাংশু নয়, যেন একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মুখ থেকে শব্দ বেরুলো : স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীর জন্যে কতো তপস্যাই তো করেন—এ আর আপনার কাছে এমন কী কঠিন প্রত্যাশা করা হচ্ছে?

—আর, স্বামীদের তপস্যা হচ্ছে অস্ত্রীত্বের জন্যে? ললিতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আমার জন্যে মিছিমিছি নিজেদের ব্যস্ত করবেন না। পৃথিবীতে আরো অনেক সব জটিলতরো সমস্যা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামান গে।

তার কথা বলার ধরনে সৌরাংশু হেসে উঠলো। হেসে-ওঠাতেই সে পেলো একটা নির্ভর, তার ব্যবহারের সুমিত অনুপাত। বললে,—কিন্তু তাঁর যদি একটা ভুলই হয়ে থাকে, সে ভুল ভাঙবার জন্যে চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?

—ক্ষতি তার, ক্ষতি তার মনুষ্যত্বের, যে চেষ্টা করবে। ললিতা

যেন নিজের অনুভূতির গভীরতম অন্ধকারে ডুবে গেলো : ভুল কেউ কারুর ভেঙে দিতে পারে না, যদি তা না আপনি ভাঙে। আর তাঁর সেটা ভুলই বা আপনারা কী করে ভাবছেন? আর, আপনার-আমার কাছে সেটা ভুল হলেই বা কী এসে যায়—সেটা তাঁর কাছে সত্য। তেমনি আমারো হয়তো একটা সত্য আছে---সেই সত্যে আমি একা। ভুল ভেঙে দিয়েই বা লাভ কী?

সৌরাংশু তার এই উক্তির গভীরতাকেও সম্মান করলো না, লঘুকণ্ঠে বললে,--ধরুন, যদি একদিন সেই ভুল আপনা থেকেই ভেঙে যায়, আর আপনি না গিয়ে তিনিই একদিন সশরীরে ফিরে আসেন, ফিরে আসেন তাঁর সংসারের পরিবেশে, তাঁর স্ত্রীর নির্জনতায়—

ব্যাপারটা যেন কত অসম্ভব, এমনি একটি ধূসর রেখাহীনতায় ললিতা হেসে উঠলো। নির্লিপ্ত গলায় বললে,—আসবেন। ফিরে আসতে তাঁর বাধা কী? আমাদের দু'জনের জন্যেই জায়গা এখানে যথেষ্ট, এই পৃথিবীতে। তিনি যদি তাঁর তপস্যায় উত্তীর্ণ না হতে পারেন, সেইজন্যে আমিও পারবো না, এমন কথা কোথাও লেখা নেই। তিনি যদি বদলাতে পারেন, আমিও হয়ে উঠতে পারি নতুন মানুষ, খুঁজে পেতে পারি নতুন পরিবেশ, নতুন নির্জনতা। ভুল আমারো ভেঙে যেতে পারে, সৌরাংশুবাবু।

—তার মানে, সৌরাংশু ঘরের জোরালো আলোয় যেন হাঁপিয়ে উঠলো : তার মানে, উনি যদি কোনোদিন ফিরে আসেনও, আপনি তাঁকে প্রসন্ন পরিপূর্ণতায় গ্রহণ করবেন না?

—কী করেই বা করবো? ললিতা হঠাৎ অদ্ভুত করে হেসে উঠলো : আমার জীবনে সে-দিন্ যে কবে অস্ত গেছে, সেই দিন, যে-দিন সমস্ত দেহে-মনে আমি শুধু অশরীরী স্বামিত্বের ভাবময় একটা আবেশের মধ্যেই ডুবে ছিলাম। আজ সেই মেঘ সত্যের সূর্যালোকে গেছে দূর হয়ে। এখন ভাবের চেয়ে ব্যক্তিকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিতে শিখেছি। আমি আর সে-ললিতা নেই।

—কিন্তু যাকে আপনি সত্য বলে অহঙ্কার করছেন, সে-ও তো একটা ভাব, ভাবের ক্ষণিক একটা ছটা ছাড়া কিছু নয়। সৌরাংশুর গলা এতোটুকুও টললো না।

—কক্‌খনো নয়, ললিতা চেয়ার ছেড়ে সেই বিচ্ছুরিত দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়ালো: সেই সত্য আমি নিজে, নিজেকে নিয়ে আমার নিজের এই রচনা, একান্ত করে নিজের এই হয়ে-ওঠা।

ললিতা তার কথার অন্তরালে একটি সুদূর প্রচ্ছন্নতা নিয়ে এলো। সেই প্রচ্ছন্নতার ঘন, উষ্ণ অন্ধকারে অভিভূতের মতো এলো সে এক পা এগিয়ে, সৌরাংশুর চেয়ারের দিকে।

আচ্ছন্ন, অবশ গলায় বললে,—আর কোথাও আমাকে নিয়ে যেতে পারেন না?

সৌরাংশু স্তম্ভিত হয়ে রইলো: আর কোথায়?

—এই ঘরের, এই পরিচয়ের বাইরে—বহু দূরের বিরাট একটা নিশ্চিহ্ন শুভ্রতায়?

ললিতাকে শোনা গেলো অন্ধকারের কাকুতির মতো।

সৌরাংশু প্রখর. স্পষ্টতায় সতেজ গলায় বললে,—আমি কোথায় নিয়ে যাবো? এই তো আপনি বেশ আছেন নিজের নিষ্ঠুর সত্য নিয়ে। বলছিলেন না, সেই সত্যে আপনি একা, আপনি নিজেই যথেষ্ট। মিছিমিছি আর কাউকে তবে ব্যস্ত করছেন কেন?

ললিতার মুখে আর একটিও কথা এলো না, ঘরের আলো তার মুখের সমস্ত আর্দ্রতা যেন শুষে নিলো। সে বসলো গিয়ে ফের সেই জানালার ধারে, ক্লান্তিতে রাশীভূত হয়ে। স্তব্ধতায় হঠাৎ সে গেলো মুছে, তার বসবার এলোমেলো আলস্যে।

ঘরে ঘনিয়ে উঠতে লাগলো কথা-না-বলার করুণ অন্ধকার।

ললিতা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে রুক্ষ গলায় বললে,—আপনি তবে আর এখানে বসে আছেন কেন? সেই দিন থেকে যে সুমনা-দি আর আসছেন না পড়াতে, তা তো জানেনই।

—হ্যাঁ, যাই। সৌরাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মিথ্যা কথা, সৌরাংশু স্পষ্ট দেখতে পেলো, ললিতার এই ভঙ্গিটা কোমল প্রতীক্ষার ভঙ্গি, আনমিত বশ্যতার, তাতে নেই তার সত্যোপলব্ধির কোনো তীক্ষ্ণতা। তার মাঝে আজো যেন কাঁদছে একটি ঘর, তপ্ত সুনিবিড় একটি তৃষ্ণা, মরুভূমির পারে মুমূর্ষু একটি মরীচিকা। সেই দিন তার আজো অস্ত যায় নি, তার দীর্ঘায়মান বিধুর ছায়াগুলি এখনো তার জীবনে লেগে আছে।

॥ চোদ্দ ॥

যে-পরীক্ষার জন্যে এতো তোড়জোড়, এতো ব্যস্ততা, শেষ পর্যন্ত তারই কাছাকাছি এসে ললিতা হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো। ছুঁড়ে ফেলে দিলো বইয়ের বোঝা, রাশি-রাশি অক্ষরের অত্যাচার। বিবর্ণ, বিস্বাদ হয়ে উঠেছে তার দিন-রাত্রির পৃষ্ঠা, শেকলে-বাঁধা এই নিষ্ঠুর পারম্পর্য্য। অবকাশের অরণ্যে সে যে একটি আশ্রয়ের নীড় তৈরি করেছিলো, তাই এখন তার কাছে মনে হতে লাগলো আর্ত, অন্ধ, পরিশূন্য একটা গুহার মতো। অক্ষরের আলোতে সেই অন্ধকার সে আর কতোটুকু তরল করবে, দৈত্যকায়, দুর্দান্ত সেই অন্ধকার? মনের বিরাট এই নৈঃশব্দ্যের সামনে কতোক্ষণ জ্বলবে এই অক্ষরের মুখরতা, চপল, ক্ষীণায়ু এই অক্ষর? ললিতা অক্ষরের বিস্তীর্ণ জনহীনতায় কোথাও কোনো পার দেখতে পেলো না,—কতদূর সে হাঁটবে, কতো আর উলঙ্গ রৌদ্র, কতো আর আতীব্র রাত্রি? অক্ষরের দীপশিখায় কার সে আরতি করবে, ছোঁবে সে কোন নিশীথ-তারা? কেন এই আয়োজন? বিচ্ছিন্ন কতোগুলি অক্ষরের পাথরে বাঁধতে পারবে কি সে তার এই শূন্যতার সমুদ্র? ছায়া-শীতল করে তুলতে তার এই মুক্তির মরুভূমি!

ললিতা চলে এলো পাশের বাড়ি, বিকেলের দিকে, কল্যাণী যখন টানা আয়নার সামনে দাড়িয়ে চুল বাঁধা সাঙ্গ করে চিরুনির উলটো পিঠ দিয়ে সিঁথির উপর সিঁদুর আঁকছে—কম্পান্বিত, শীর্ণ, তীক্ষ্ণ একটি রেখায় তার শরীরের সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত রক্তিমা। ললিতা একেবারে তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, খুসিতে উচ্ছলে উঠে বললে,—তোমার জন্যে খুব একটা শুভ-সংবাদ এনেছি,

কল্যাণী এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ালো। তৃপ্ত চোখে ললিতার দুই চোখ পান করতে-করতে বললে,—সত্যি, সত্যি শুভসংবাদ?

—ভীষণ। তুমি তা ভাবতে পারবে না।

—আমি তা খুব সহজেই ভাবতে পারি। কল্যাণী নিমেষে আবার গম্ভীর হয়ে গেলো। ললিতাকে আরো কাছে টেনে এনে তার কপালের থেকে চুলের উড়ন্ত ক'টি রুক্ষ গুচ্ছ এদিক-ওদিক সরিয়ে দিয়ে বললে,—অথচ অত সহজে ভাববার জিনিস যেন তা নয়, সে ভীষণ, অসহ্য সে সুখ। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়েও যেন তা আয়ত্ত করা যায় না।

ললিতা তাড়াতাড়ি পিছলে সরে এলো। দুই চোখ কপালে তুলে বললে,—তুমি এ-সব কী বলছ?

—কেন, মহীপতিবাবু কি ফিরে আসেন নি?

—সর্বনাশ। ললিতা হেসে কুটি-কুটি হয়ে যেতে লাগলো, ছোট-ছোট দাঁতে টুকরো-টুকরো হয়ে যেতে লাগলো ঘরের সেই ঘোলাটে স্তব্ধতা। হাসির হাওয়ায় উড়তে-উড়তে ললিতা বসলো এসে কল্যাণীর বিছানার উপর—সদ্যপাতা, নতুন, নিভাঁজ বিছানা। দু'হাত তুলে চুলের খোঁপাটা চূড়া করে বাঁধতে-বাঁধতে বললে,—বাবাঃ, তুমি একেক সময় এমন ভয় দেখাও। বলে কিনা কে-না-কে আসবে। আর আমি এসেছি গায়ে পড়ে তোমাকে যেই খবর দিতে। বলতে-বলতে ললিতা আবার হাসির ঘায়ে ফেটে পড়লো।

—তবে, কল্যাণী অভিভূতের মতো জিগগেস করলে: তবে তার চেয়ে তোমার আর কী শুভসংবাদ হতে পারে?

—কতো, কতো কিছু হতে পারে। কথাগুলি ললিতার হাসির জলে ঝিনুকের মতো ঝলমল করে উঠছে: কারু সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতে পারি, চলে যেতে পারি কোথাও আর-কোনো আকাশের নির্জনতায়, আর-কোনো মৃত্যুর অন্ধকারে। কতো—

কতো-কিছু ঘটে যেতে পারে। আমাদের জীবনে শুভসংবাদ কি শুধু একটা!

ললিতাকে আজ যেন কেমন অতীন্দ্রিয় দেখাচ্ছে, সায়ন্তন দিগন্তরেখার মতো অস্পষ্ট। তার সমস্তটি শরীর যেন নিরুত্তাপ, নীরেখ একটি শিখা, যেন আর ভার নয়, পরিব্যাপ্ত প্রচ্ছন্ন একটি অনুভূতি। সে কোনোদিন এত অশরীরী ছিলো না, ছায়ায় এতো শীতল, ভঙ্গিতে অনুচ্চারিত। ছিলো সে এতোদিন শীতের রাতের মতো ধারালো, নির্ঝরের জলের মতো ধাবমান। তাকে দেখায় নি কোনোদিন নিরুত্তর একটি সঙ্কেতের মত, রহস্যে এমন রঙিন। চুলের গুচ্ছ ক'টির শিথিল খসে-পড়া থেকে পায়ের নিটোল দুটি বেঁকেযাওয়া পর্যন্ত কোথাও যেন তার শরীরের উল্লেখ নেই, সে নির্বাপিত একটি গতি, সমর্পিত একটি প্রতীক্ষা। যেন চলে এসেছে সে আত্মার অননুভূয়, গভীর একটি আবেশের মধ্যে।

কল্যাণী বিছানায় তার পাশে এসে বসলো। গলা নামিয়ে বললে —কেন, তেমন-কিছু শুভসংবাদ আছে নাকি সত্যি?

—পাগল। তেমন শুভসংবাদ আমি পাবো কোথায়? ললিতা জোরে হেসে উঠতে চাইলো, ঠিক নিবে যাওয়ার আগে আলোর নির্লজ্জ উল্লাসের মত: সমস্ত পৃথিবী ঘুরে কোথায় খুঁজে পাবো সেই নতুনতরো আকাশ, সেই আমার নিজের নির্জনতা। পাগল! আমার আবার শুভসংবাদ। নিতান্ত ছোট, নিতান্ত কিছু একটা নতুন না করলে আর নয়।

—কী? কল্যাণীর গলা উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠলো।

—পড়া, লেখা-পড়া, লেখা আর পড়া—সব আমি ছেড়ে দিয়েছি, কল্যাণী। ললিতা হঠাৎ শিশুর মতো হেসে উঠলো: তোমাকে তেমন কিছু গভীর কথা শোনাতে পারলাম না। একেবারে সাধারণ, একেবারে তুচ্ছ—কিন্তু কী করবো বলো, জীবনে আর আমরা তেমন ক'টা শুভসংবাদের নাগাল পাই?

—কেন ছাড়লে ?

—কেন ছাড়লাম ? বা রে, ললিতার সমস্ত মুখ উন্মোচিত, বিশাল একটা ফুলের মতো সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : তুমিই তো বলেছিলে লেখাপড়া করে কী আর আমাদের হবে ? কেন, কিসের জন্যে আমরা পড়বো ? তুমি কেন আর পড়ো না ? তুমি কেন তবে ছেড়ে দিলে ?

ললিতার আজ কূল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাকে বুঝতে যাওয়া আজ বিড়ম্বনা। কল্যাণী তার একখানি হাত কোলের উপর টেনে এনে বললে,—আর ভালো লাগলো না বুঝি ?

—যা ভালো লাগে তা আমরা করি, আর যা ভালো লাগে না তাই আমরা করি না—সব সময়ে তাই আমাদের ধর্ম নয়, কল্যাণী। ললিতার মুখ আবার ধীরে-ধীরে মুছে গেলো : তা হলে আর আমাদের দুঃখ ছিলো না। যা ভালো লাগে না তাই যদি আমরা ছাড়তে পারতাম, তবে যা আমাদের ভালো লাগতো তাই নিতাম দু'হাত ভরে সঞ্চয় করে, সমস্ত আকাশ শূন্য করে—যা আমাদের ভালো লাগতো, যাতে আমরা পূর্ণ, একটি মুহূর্তের জন্য, একটি চিরন্তন মুহূর্তের জন্যেও পরিপূর্ণ হয়ে উঠতাম।

কল্যাণী তার দিকে নিস্পন্দের মতো চেয়ে রইলো।

—তুমি, তুমি কেন তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ ? ললিতা আহতের মতো জিগগেস করলে : কেন, তোমার আর ও ভালো লাগলো না বলে ? শুধু ভালো লাগলো না বলে ?

—তা কেন ? কল্যাণী ঘন, পরিতৃপ্ত ঠোঁটে একটু হাসলো : আমি তা ছাড়লাম তাব চেয়ে আরো বৃহত্তরো ভালোর সন্ধান পেলাম বলে। বইয়ের শুকনো পাতার চেয়ে একদিন আমার মাঝে আমি বেশি স্বাদ, বেশি রহস্য আবিষ্কার করলাম, তাই।

ললিতা ক্লান্ত, মুহ্যমান চোখে ঘরের চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াতে লাগলো। ঘরময় উৎসারিত হয়ে পড়েছে কল্যাণীর চিত্তের

পূর্ণতা ভোরবেলাকার প্রথম রোদের মতো। ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরের লাবণ্য ঘরের কোমল পরিচ্ছন্নতায়। তার বৃহত্তরো ভালো। খাটের উপর নিভৃত বিছানা, নিশীথ-রাত্রের গাঢ় একটি ঘুম দিয়ে তৈরি; শরীরে তার প্রসাধিত কান্তি, বিস্তীর্ণ একটি স্পর্শের ছায়ায় কমনীয়। তাকের উপর গৃহসজ্জার ছোটখাটো অকিঞ্চিৎকর উপকরণ, কবিতার ভাঙা-ভাঙা কয়টি কথা, টেবিলের উপর সাজানো ক'খানি বই, ভালো লাগে না বলে যা আর সে কোনোদিন পৃষ্ঠা উলটেও একবার দেখে না। তার বৃহত্তরো ভালো। ওপারের বারান্দায় দাইর কোলে তার ছেলে খাঁচার ময়নাটার সঙ্গে ছোট-ছোট মুঠি ঘুরিয়ে খেলা করচে। তার স্বপ্নের একটি টুকরো, তার রক্তের একটি গান। চারপাশের দেয়ালগুলো সাদা, প্রখর, উচ্চকিত—যেন কার নিষ্ঠুর প্রতীক্ষায়, কার ফিরে-আসার স্বপ্নে। বাইরে এত জনতা, এত কোলাহল, তবু সমস্ত ঘরটি কেমন সঙ্ক্ষিপ্ত—উত্তরঙ্গ সমুদ্রের কোলে নিভৃত একটি দ্বীপের মতো—এই নীরব ঘর, এই ঠাণ্ডা বিছানা, এই সাদা দেয়াল। আকাশের বহুদূর নির্জনতা দিয়ে তৈরি, ঘুমের গহন প্রশান্তি দিয়ে।

ললিতা হঠাৎ সমস্ত শরীরে ছটফট করে উঠলো। যেন কে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে; তার থেকে সবলে ছাড়া পাবার জন্যে সে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। বললে,—তেমন আমারো জীবনে বৃহত্তরো ভালোর সন্ধান আমি খুঁজে পেয়েছি। যেখানে আর সমস্ত আয়োজন অবান্তর আমার এই একান্ত করে আমি হওয়া ছাড়া। তেমনি আমারো জীবনে পূর্ণতার একটা দুর্দান্ত পিপাসা আছে। আচ্ছা, তুমি বোসো, আমি চললাম।

—কোথায়? কল্যাণী তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো: শ্বশুরবাড়িই ফিরে যাবে ঠিক করেছ বুঝি?

—যমের বাড়ি। দরজার কাছে এসে ললিতা আবার আরেক

পশলা হাসি ঝরিয়ে দিলো: পৃথিবীতে জায়গা শুধু আমরা সেই একটাই নিয়ে আসি নি। আরো অনেক জায়গা আছে।

ললিতা বাইরে বেরিয়ে এলো। কল্যাণীদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি আর কতোটুকুনই বা পথ। সেই পথটুকুতে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত পৃথিবীর সে কোনো সীমা খুঁজে পেলো না। যেমন খুজে পাচ্ছে না তার এই অনুভূতির কোনো ভাষা। সেই পথটুকুই যেন বিশাল পৃথিবীর বিসর্পিল সব পথের প্রতীক হয়ে তাকে ভয় দেখাতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সে তার ঘরের কোটরে, তার দৈনন্দিনতার আচ্ছাদনে।

সৌরাংশুব মুখেও সেই কথা:

—শুনলাম আপনি নাকি এবছর আর পরীক্ষা দেবেন না!

ললিতা একটা ইজিচেয়ারে পুঞ্জ-পুঞ্জ শিথিলতায় স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলো। শরীরে একটুও চমক না এনে আলস্যের তেমনি স্তিমিত আভাময়তায় সে বললে,—কোনো বছরেই নয়। আমি ও ছেড়ে দিয়েছি।

—বলেন কী? সৌরাংশুকে যেন কে আকস্মিক আঘাত করলে: পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছেন?

— একেবারে। কী হবে আমার পড়াশুনা করে? ললিতা শ্রান্ত, দীর্ঘ চোখে সৌরাংশুর দিকে তাকালো: কার জন্যে আমি পড়াশুনো করবো?

—বা, মানুষে আবার কাব জন্যে পড়াশুনো করে? নিজের উন্নতির জন্যে।

—দয়া করে আর আমার কাছে মাষ্টার-মশাই হবেন না। ললিতা বাঁকাচোরা ভঙ্গুর কটি রেখায় আধখানা উঠে বসলো: আমি নিজের জন্যে নই, নিজের একাকীত্বের উন্নতিতে আমি আর বিশ্বাস করি না

সৌরাংশু কেমন ধাঁধিয়ে গেলো। কথাটাকে নিজের মনোমত অর্থে নিয়ে গিয়ে একটু জোর গলায়ই বললে,—নিজের জন্যে কেউ আমরা নইই তো একলার। যেটুকু আপনি শিখবেন, আশে-পাশে পরকে তা আবার দান করে যাবেন।

—অর্থাৎ আপনার মতো আমিও একজন মাষ্টার হবো? ললিতা হাসির তরলতায় চেয়ারে আবার ঢলে পড়লো: ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

—না; আপনি বুঝতে পারছেন না। সৌরাংশু অস্থির হয়ে উঠলো। ঘরে নিঃশ্বাসহীন নিঃশব্দতায় অন্ধকার জমে উঠেছে। সেই শব্দহীন অন্ধকারের ভার সবলে সরিয়ে দিয়ে সৌরাংশু বললে,—এই পড়াটাই আপনার দাঁড়াবার ভিত্তি, আপনার আত্মরক্ষার অস্ত্র। পড়া কখনো ছাড়তে হয়? বিশেষ, আপনার মতো অবস্থায়, আপনার মতো—

অনর্গল হাসির প্রবলতায় ললিতা সৌরাংশুর মুখের কথা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। বললে,—কেন, আমার আবার এমন কী অবস্থা দেখলেন? এই তো আমি দিব্যি আছি—কিছু-না-করার, কিছু-না-হওয়ার চমৎকার অন্ধকারে।

—কিন্তু কতো দিন? সৌরাংশু দূরে জানালার পাশে আরেকখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লো: সংসারে একদিন আপনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, ধরুন মহীপতিবাবু যদি আর একেবারেই ফিরে না আসেন, আপনার সামনে তখন ভয়াবহ, বিশাল ভবিষ্যৎ। সেদিন আপনি একেবারে একা, যেদিন ধরুন, ধরণীবাবুর ওপর আপনি আর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছেন না। তখন, সেই দুর্দিনে, আপনি কী করবেন, কী সম্বল আপনার আছে নিজেকে রক্ষা করবার, নিজের একাকীত্বে, নির্ভয় আত্মসম্মানে?

সেই হাসির ছোট-ছোট ক'টি দাগ ললিতার মুখে তখনো লেগে ছিলো। এক দ্রুত, দীর্ঘ নিশ্বাসে মুখের সমস্ত কোমলতা সে মুছে

ফেললে। মেরুদণ্ডটা আস্তে আস্তে টান করতে-করতে বললে,—আমার জন্যে আপনাকে আর ভাবতে হবে না, আমার আত্মসম্মানের জন্যে। জীবিকাই যদি আমার জীবনের প্রধান সমস্যা হয়, আমার এই নিরভিভাবক একাকীত্ব, তবে, ললিতার মুখ সহসা পাংশু হয়ে গেলো : তবে আমি শ্বশুরবাড়িতেই একদিন ফিরে যাবো, এবং তা যতো শিগ্‌গির হয় ততোই আমার ভালো। আমার শ্বশুরমশাই বাইরে যতোই কঠিন হোন না কেন, ভেতরটা তাঁর স্নেহে গলে যাচ্ছে। তাঁর সংসারে এত জায়গা, এত স্বচ্ছলতা, যে, আমি অনায়াসেই হয়তো এক কোণে একটু ঠাঁই করে নিতে পারবো।

সৌরাংশুর মুখের উপর কে যেন তীক্ষ্ণ একটা চাবুক মারলে। শরীবের সমস্ত রক্ত যেন সাদা হয়ে গেলো। ঘরেব অনড় দেয়াল কথা কইলো : আপনি শেষকালে শ্বশুরবাড়িতেই ফিরে যাবেন ?

—হ্যাঁ, স্পষ্ট, সতেজ গলায় ললিতা বললে—আমি একরকম প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। কেন যাবো না, ওখানে ছাড়া হিন্দু-মেয়েব আর গতি কোথায় ? জীবিকার সমস্যাটা যদি এতো সহজেই মিটে যায়, তবে মিছিমিছি কেন আর নিজেকে বিব্রত করা বলুন ? দু' বেলা দু' থালা ভাত তো কেউ আমার সেখানে কেড়ে রাখছে না। আমি কেন তবে আব ভাবছি ?

সৌরাংশু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। পরে ঈষৎ তিক্ততার সঙ্গে বললে—সমস্যার চমৎকার সমাধান বার করেছেন এতো দিনে। কিন্তু আপনার এই বিস্তীর্ণ শূন্যতা আপনি কিসের জোরে সমস্ত জীবনভোর বয়ে বেড়াবেন শুনি ? কী করে, কী নিয়ে কাটবে আপনার দিন, রাশি-রাশি দিন, একটানা এই দিনের অক্লান্তি ? এই অগণন মুহূর্তের অত্যাচার ?

—যেমন করে আরো অনেকের দিন কাটে। কথায় ললিতা এককণা আর্দ্র আকুলতা আসতে দিলো না : তবু তো আমার

একটা আশা আছে, আমি আমার স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারবো।

আশ্চর্য, সৌরাংশু হঠাৎ বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলো: আপনি বসে বসে আপনার স্বামীর ফেরবার প্রতীক্ষা করবেন?

—নিশ্চয়। ললিতার শরীরে দৃঢ়তার একটা তীক্ষ্ণ ভঙ্গি সহসা উচ্চারিত হয়ে উঠলো: এর অতিরিক্ত আমার আর কোনো কাজ নেই, সম্পদ নেই। আমি সারাদিন, রাশি-রাশি দিন, আমার স্বামীর ফিরে-আসার প্রতীক্ষায় ক্ষয় করে যাবো। বলুন, এর বেশি আমার কী কাজ, কী সম্মান?

—যদি তিনি আর না আসেন কোনদিন?

—না-ই বা এলেন। আমার মৃত্যু তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমারো সেই মৃত্যু।

—আর যদি ফিরে আসেন একদিন?

রাত্রির মর্মরিত অরণ্যের মতো ললিতা যেন সর্বাঙ্গে ব্যাকুল, বিধুর হয়ে উঠলো: সে আমার উৎসবের পরম শুভলগ্ন হয়ে দেখা দেবে সৌরাংশুবাবু। তখন কিসের আমার লেখাপড়া, কিসের আমার সাজসজ্জা! আমি—আমি রাত্রির মতো গলে যাবো সেই নিদারুণ সূর্যোদয়ে। সে-কথা ভাবতেও আমি আনন্দে মরে যাচ্ছি।

আহতের মতো সৌরাংশু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো: ফিরে এলে তাকে আপনি গ্রহণ করবেন?

ললিতা মলিন একটু হাসলো: বা, গ্রহণ করবো না? যার জন্যে দিন গুনছি, প্রতি মুহূর্তে যার শুনছি পায়ের শব্দ, ফিরে এলে গ্রহণ করবো না তাকে? তার বেশি আর কী আপনি আশা করতে পারেন আমার কাছে?

—গ্রহণ করবেন? উত্তুঙ্গ পর্বত-চূড়া থেকে সৌরাংশু যেন নিচে পড়ে যাচ্ছিলো, চেয়ারের হাতলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে

চেপে ধরে সে নিজেকে রক্ষা করলো : যে আপনাকে একদিন পায়ের ধুলোর মতো অনায়াসে ত্যাগ করে গেলো? একটিবার ফিরেও চাইলো না, ফিরেও চাইলো না আপনার এই ব্যর্থতার দিকে। একবার ভেবেও দেখলো না সে চলে গেলে আপনি কী করবেন, কী করতে পারেন আপনি, কী করবার আপনার আছে। তাকে—তাকে আপনি স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে গ্রহণ করবেন? যার মাঝে নেই এককণা প্রেম, একফোঁটা কর্তব্য! এই আপনার সত্য, আপনার মনুষ্যত্ব—এরি জন্যে আপনি এতোদিন অহঙ্কারে ফেটে পড়ছিলেন?

—নিশ্চয়। কথার প্রবল ঝাপটায় ললিতার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো : এরি জন্যে। এর চেয়ে স্ত্রীর আর কী আদর্শ আচরণ থাকতে পারে বলুন? এরি জন্যে এরি দিকে ঠেলে দেবার জন্যে আপনারই তো একদিন সকলে সদলে আমাকে আক্রমণ করেছিলেন, ভুলে গেছেন এরি মধ্যে?

—পরের কথায় আপনি ছাড়বেন আপনার সত্য, হারাবেন আপনার সম্মান?

—পরের কথায় কেন হতে যাবে, আমি নিজে বুঝি না? ললিতা লুকোনো তেজে জ্বলতে লাগলো : সমস্ত সংগ্রামের মাঝে আমি নিজে কী অনুপস্থিত? আমি নিজে বুঝি না কী আমাকে করতে হবে, কী না করলে আমার নয়, সমস্ত সংসারে কিসে আর কোথায় আমি সব চেয়ে নিরাপদ—আপনাদের এই সামাজিক দস্যুতার বিরুদ্ধে? হ্যাঁ, পরের কথাই তো আমাকে শুনতে হচ্ছে! আমি নিজে একেবারে খুকি কিনা!

সৌরাংশু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝাঁজালো গলায় বললে,—এ আপনার কাছ থেকে আমি আশা করি নি কোনোদিন।

—তবে কী আশা করেছিলেন? ললিতাও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচ্ টেনে দিলো। যেন সৌরাংশুর মুখে

ছুঁড়ে মারলো এক ঝলক তীব্র আলো, শাণিত একটা চাবুকের মতো। বললে,—কী আশা করেছিলেন আমার থেকে? আশা করেছিলেন যে আমি বিবাহিত হয়ে আমার স্ত্রীত্বকে অস্বীকার করবো? মানবো না আমার সাধব্যের সম্পদ? স্মৃতির এই অপূর্ব সমারোহ? বলুন, কী আশা করেছিলেন? চেয়েছিলেন যে আমি গোপনে আর-কাউকে ভালোবাসবো, সে যতোই হোক নিষ্ঠুর ও নিরুত্তর, তবু তার জন্যে করবো প্রতীক্ষা, তাকে নিয়ে আঁকবো নতুন জীবনের সূচনা? দরকার হলে যাবো দেশ ছেড়ে? ললিতা দীপ্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: মিথ্যা, মিথ্যা, যদি তা ভেবে থাকেন, প্রতিটি অক্ষরে তা মিথ্যা। বলুন, কী আশা করেছিলেন তবে? আমার কাছে কী আশা করেছিলেন?

দরজার দিকে সরে যেতে-যেতে সৌরাংশু স্তিমিত, স্নিগ্ধ গলায় বললে,—তেমন-কিছু অসংযত বা অন্যায় আপনার কাছে আশা করি নি।

—অন্যায়? ললিতা উত্তেজনায় প্রায় কেঁদে ফেললে।

—যাই হোক, তেমন উদ্ধত বুদ্ধিহীনতা আপনাকে পেয়ে বসুক, এমন আশা কেউ করে নি আপনার কাছে। সৌরাংশু আরো এক পা সরে গেলো: চেয়েছিলাম আপনি দৃপ্ত, দুর্দমনীয় হয়ে উঠবেন আপনার ব্যক্তিত্বের সাধনায়। ভর দিয়ে দাঁড়াবেন নিজের অটল স্বাতন্ত্র্যে। নিজেকে বিকীর্ণ করে দেবেন মহত্তরো কাজের উৎসাহে—পৃথিবীতে কত কাজ—আপনি দুহাতে তুলবেন তারই গর্বিত পতাকা। আপনি শিখবেন, ভাববেন, বড়ো হবেন—কাজে ভরে তুলবেন আপনার সমস্ত রিক্ততা। সৌরাংশু নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেলো: জানি না কী চেয়েছিলাম আপনার কাছে। এমন কুৎসিত বশ্যতা কক্‌খনো নয়, নয় বা তেমন কোন অশোভন অমিতাচার।

ঘরের আলোটা চারদিকে যেন হাহাকার করে উঠলো। আলোটা

নিবিয়ে দিতে তার হাত উঠলো না। সৌরাংশুর চলে যাওয়ার শূন্যতা যেন তা অবারিত করে দিয়েছে। দাঁড়ালো সে আলোর আশ্রয়ে। কিন্তু সেই উদগ্র স্পষ্টতা যেন সে সহ্য করতে পারলো না। দুই হাতে চোখ ঢেকে সে হঠাৎ কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো, চোখের অন্তর্লীন সমস্ত অন্ধকারকে সম্বোধন করে বল্‌লে: হায় ব্যক্তিত্ব, হায় বুদ্ধিহীনতা!

॥ পনেরো ॥

ধরণীবাবু ব্যাপারটাকে অন্য আলোয় দেখলেন। মনে-মনে একরকম খুসিই হলেন বলা যায়। অথচ বারে-বারেই তাঁর মনে হতে লাগলো এ-ধাপটা যেন ললিতাকে মানাচ্ছে না, যেন কোথায় একটা বাধা পেয়ে তাকে থামতে হচ্ছে। এ ঠিক তার অক্ষমতা থেকে আসছে না, খানিকটা যেন অভিমান থেকে। কিন্তু কেন বা যে এই অভিমান তা তাঁকে কে বোঝাবে?

তিনি মাঝামাঝি একটা পথ নিলেন। বললেন,—হ্যাঁ, পরীক্ষা পাশ করে কীই বা আর হতো?

ললিতা বসে-বসে ধরণীবাবুর সার্টে ঝিনুকের বোতাম পরাচ্ছিলো। নিচের ঠোঁটে স্ঁচ ডুবিয়ে স্থতো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে সে বললে,—কিছুতেই কিছু হতো না, বাবা।

ধরণীবাবু আপিসে বেরুবার সাজগোজ করছিলেন। মোজার গার্টার বাঁধতে-বাঁধতে বললেন,—পাশের মধ্যে কাণাকড়ি বিদ্যেও নেই। যারা সত্যিকারের শিখতে চায়, তারা পাশ করার অপেক্ষা রাখে না।

ললিতা হেসে বললে,—তবু তারাই যা হোক পাশ করে। সার্টটা সে ধরণীবাবুর দিকে এগিয়ে দিলো: আমি তার জন্যে কিছু ভাবছি না।

—তার জন্যে আবার ভাববি কী? আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কলারটা জুৎ করে বসাতে-বসাতে ধরণীবাবু বললেন,—পড়াশুনোর এমনি একাধটু চর্চ্চা রাখলেই যথেষ্ট। সৌরাংশুকে বলবো না-হয়, সে মাঝে-মাঝে এসে তোকে সাহায্য করবে।

—সৌরাংশুবাবু? ললিতা মুহূর্তে আগুন হয়ে উঠলো: সৌরাংশুবাবু কী জানেন?

—ধরণীবাবু অপ্রতিভ হয়ে গেলেন : সৌরাংশু জানে না? তুই বলিস কী, লিলি? বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কৃতী ছেলে।

—হলোই বা না। তাই বলে আমি কী পড়বো না-পড়বো তার থেকে পরামর্শ নিতে হবে? ললিতা ছটফট করে উঠলো : আমার বিষয়ে তুমি সব সময়ে তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাও কেন, বাবা? সে আমাদের কে?

—কেউ নয়, কিন্তু বড়ো আপন, লিলি। ধরণীবাবু আবেগে গদগদ হয়ে উঠলেন : এমন ভালো ছেলে আর হতে নেই, তুইও তো তা জানিস। তার কাছে পড়তে পেলে তোর উপকারই হতো, মা।

—আমি পড়তে বসবো তার কাছে? তুমি এ বলছ কী, বাবা?

ধরণীবাবু আকাশ থেকে পড়লেন : কেন কী করলো সে?

ললিতার সহসা ইচ্ছা হলো সৌরাংশুর নামটা সে দু'হাতের তীক্ষ্ণ নখে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, জিহ্বার চাবুকে ক্লেদাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। অনেক কষ্টে নিজেকে সে নিজে শাসন করলে, দাঁড়াবার কঠোর ভঙ্গি করে বললে,—কিছু সে করুক বা না করুক, আমি কী করবো না-করবো তার মাঝখানে সে আসে কী করে? তার কাছে আমি সাহায্য নিতে যাবো কেন, আমাকে সাহায্য করে তারই বা কী এমন স্পর্দ্ধা জিগ্‌গেস করি? আমি কী পড়বো না-পড়বো সে তার জানে কী? কে সে?

ধরণীবাবু শান্ত গলায় বললেন,—না ওটা আমিই নিজে সাজেষ্ট করছিলাম। বেশ তো, তোর খুসিমতোই তুই পড়বি, যা তোর মন চায়।

—হ্যাঁ, যা আমার মন চায়। আমার খুসিমতো।

ব্র্যাকেট থেকে টুপিটা তুলে নিতে-নিতে ধরণীবাবু বললেন—শুনলাম তুই নাকি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবছিস—সত্যি?

ললিতা আবার জ্বলে উঠলো : তোমাকে কে বললে ? তোমার ঐ বিশ্ববিত্তালয়ের কৃতী ছেলে ?

—হ্যাঁ, তুই নাকি তাকে বলেছিস সে-কথা ?

—বলেছি ? পৃথিবীতে আর আমার জায়গা নেই, সংসারে নেই আর কোনো কাজ, দুঃখে-অপমানে ললিতার চোখে জল এসে গেলো : তাই শ্বশুরবাড়ির দোর ধরে আমি বাকী জীবনটা ধূলোয় বসে কাটিয়ে দেবো—বলেছি তাকে সে-কথা ? সে তোমাকে তাই বললে ?

—কী বলেছে আমার মনে নেই, ধরণীবাবু উপস্থিত মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন : কিন্তু তাই যদি বলেও থাকিস তাতে লজ্জার বা রাগের কী আছে, ললিতা ?

—রাগের নেই ? তুমি বলো এতে কোন মানুষ চুপ করে থাকতে পারে ? ললিতা তার শাণিত শীর্ণতায় ঝকঝক করে উঠলো : আমি কোথায় যাই না-যাই, তাতে তার কী মাথাব্যথা ? সে কেন বলে, কোন অধিকারে সে আমাদের ঘরোয়া সমস্তার মাঝে মাথা গলাতে আসবে ? তার কী দাবি আছে সে আমাকে উপদেশ দেয়, আমাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ? তাকে এখানে আর কেন রেখেছ ? তাকে ছাড়া ত্রিভুবনে কি আর নটুর মাষ্টার জোটে না ?

ধরণীবাবু তার পিঠে আলগোছে একটু হাত বুলিয়ে বললেন,—তুই তার ওপর হঠাৎ এতো চটে গেলি কেন, মা ? সৌরাংশু ভারি ভালো ছেলে, ভারি অমায়িক, একেবারে আমার ছেলের মতন। আমার সব কাজে ডান হাত, সে আমার সংসারের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে।

—সে একেবারে তোমার কাঁধে চেপে বসেছে, বাবা। ললিতার কথাগুলি বিরক্তিতে বিষ হয়ে উঠলো : তোমার সে যারই মতন হোক, আমার কে ? কেন আমার কাজে সে হাত বাড়াতে যাবে ? তাকে বলে দিয়ো বাবা, সে তোমার ডান হাত হতে পারে, কিন্তু আমার পায়ের নখের কণাও সে নয়।

ধরণীবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন : কিন্তু তোর কাছে কী যে সে অপরাধ করলো কিছুই বুঝতে পারলাম না, ললিতা।

—কী করে বুঝতে পারবে ? সে যে তোমার ডান হাত। তাই তো সে সাহস করে আমাকে এমনি অপমান করতে পারে ?

—অপমান ?

—অপমান নয় ? আমাকে তার বেশি মূল্য দিতে যাওয়াই তো আমাকে তার অপমান করা। নইলে, ললিতার চোখের পাতা ভারি, আচ্ছন্ন হয়ে এলো : কী তার সাহস বাবা, আমাকে সে শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গায়ে পড়ে এগিয়ে আসে, আমার স্ত্রীর কর্তব্য নিয়ে প্রকাণ্ড মহাভারত আওড়ায় ? মানুষের আস্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা উচিত, আর মানুষের সহ্য করার। জলের ভারে ললিতার চোখের পাতা বুজে এলো।

—ভালো, ভালো কথাই ত বলেছে সৌরাংশু। ধরণীবাবু সরল উচ্ছ্বসিত গলায় হেসে উঠলেন। ললিতার পিঠটা সস্নেহে একবার ঠুকে দিয়ে বললেন,—পাগল, তুই একেবারে পাগল হয়ে গেছিস, ললিতা।

দু'দিন সৌরাংশুর সঙ্গে ললিতার দেখা হয়নি। দুই তলার মাঝখানের অনড় সিঁড়িটা তাদের পরস্পরকে প্রখর প্রত্যক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু সেদিন একরকম ইচ্ছে করেই ললিতা নিচে নামলো। বাড়ির পিছনে ছোট সবুজ জমিটুকুতে যে দু'টি ফুলের চারাগাছ নতুন পাতায় ঝিকঝিক করে উঠছে, সে দাঁড়ালো এসে তাদের নিভৃতিতে। কখন যে লাজুক পাতার আড়ালে ছোট-ছোট দুটি কুঁড়ি ফুটেছে সে খবরও পায় নি। পাছে ব্যথা লাগে, পাছে ভয় পায়, সেই ভয়ে ললিতা আঙুল বাড়িয়ে তাদের ছুঁলো না পর্যন্ত। শীতের পাণ্ডুতার গ্লানি কাটিয়ে নতুন আরম্ভের ঐশ্বর্যে কখন ও কী করে যে তারা লাস্যে ও লাবণ্যে এমন ভরে উঠলো তারি যেন সে কোনো সন্ধান পেলো না।

পিছনে মানুষের আওয়াজ পেয়ে সে ফুলেরই মতো সূক্ষ্ম, অশরীরী ভয়ে কেঁপে উঠলো, দেখলো সৌরাংশু। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ললিতা মনে-মনে জানে, পাছে সে ভয় পায়, পাছে তার ব্যথা লাগে, সৌরাংশু সামান্য একটি আঙুলও তার দিকে বাড়িয়ে দেবে না। তবু সর্বাঙ্গে নিরবয়ব, ঠাণ্ডা একটা ভয়ে কেঁপে উঠতে তার ভালো লাগলো।

সৌরাংশু হাসিমুখে জিগগেস করলে: কী, গেলেন না সেখানে?

কেটে গেলো সুর। নিরবয়ব ভয়ের কুয়াশা নির্লজ্জ বাস্তবতায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ঠোঁটের বাঁ কোণটা সামান্য একটু চেপে ধরে ললিতা বললে,—কোথায় আবার যাবো?

—বা, যেখানে যাবার জন্যে পা আপনি কবে থেকে বাড়িয়ে রেখেছেন। সৌরাংশু হেসে উঠলো: আপনার শ্বশুরবাড়ি। আপনার চিরন্তন প্রতীক্ষার মন্দিরে।

—যাই না-যাই, ললিতা তীব্র কণ্ঠে মুখিয়ে উঠলো: তাতে আপনার কী?

সৌরাংশু থম্‌কে গেলো। আমতা-আমতা করে বললে,—না, আমার অবার কী!

—যা আপনার নয়, তা নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাতে আসেন? কথার তাপে ললিতা যেন দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো: আপনি মাষ্টার আপনাকে প্রতি মাসে মাইনে দেয়া হয়, আপনি আপনার নিজের কাজ করুন গে, যান। সামান্য মাষ্টার হয়ে আপনাকে এ নিয়ে বুদ্ধি খাটাতে হবে না;

সৌরাংশু মুহূর্তে একেবারে ছাই হয়ে গেলো। কী যে বলবে, কী যে বলা যায়, সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

—এ নিয়ে সর্দারি করতে কেউ আপনাকে মাইনে দিয়ে পুষছে

না, এ-কথাটা মনে রাখবেন দয়া করে। ললিতা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগলো : যার যা কাজ, তাই তার কাজ। আমি এখান থেকে যাই না-যাই, তা আমি বুঝবো। আপনাকে আর রাখা হবে কি হবে না তা-ও আমাদেরই বুঝতে হবে। কী, দাঁড়িয়ে আছেন কী হাঁ করে?

সৌবাংশু যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে।

—আপনার লজ্জা করে না আমার সামনে এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে? ললিতা সতেজ, নিষ্ঠুব কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠলো : বাইরের লোক দেখলে আমাকে ভাববে কী? বাড়িতে আপনাকে থাকবার জন্যে আলাদা ঘর দেয়া হয় নি, বেঁধে দেয়া হয় নি আপনার কাজ? আমার মুখের দিকে এমনি হাঁ করে চেয়ে থাকবার জন্যে আপনাকে নেমন্তন্ন করে ডাকা হয়েছে নাকি এখানে?

সৌরাংশু প্রেতায়িত, নিঃশব্দ একটা ছায়ার মতো সেখান থেকে ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করলে।

উপরে উঠে এসে ললিতা যেন স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললে। যেন সমস্ত শবীরে নিমেষে সে অত্যন্ত হালকা হয়ে গেছে, বুকের মাঝে এতোক্ষণে স্তব্ধ হয়ে এসেছে হৃদয়ের দোদুল্যমানতা। যেন বন্য জন্তু লোকালয় থেকে শিকার সংগ্রহ কবে এনে ঢুকেছে তার অবণ্যের আশ্রয়ে—ললিতা তার এই দুর্ভেদ্য নীরবতায়। কী যেন সে এতোদিনে জয় করে এসেছে, প্রতিষ্ঠিত করে এসেছে তার নিজের নিশান অতিব্যক্ত করে দিয়ে এসেছে তার নিজের পরিচয়। যার ভয়ে এতোদিন সে সৌজন্যের জড়িমায় সঙ্কুচিত হয়ে ছিলো। সেও তুলতে পারে ফনা, করতে পারে দংশন। অন্ধকারে ললিতা নিজেরই মনে একবার হেসে উঠলো, ঘরময় পাইচারি করে বেড়াতে লাগলো বন্য জন্তুর মতো তার উগ্র, উজ্জ্বল নিঃসঙ্গতায়।

তারপর একসময় সেই স্তূপীকৃত নিঃসঙ্গতা বিছানার শুভ্রতায় গলে গিয়েছিলো বটে, মধ্যরাত্রে ললিতার ঘুম গিয়েছিলো ভেঙে। পাশের

খোলা জানলা দিয়ে তার চোখ পড়েছিলো বাইরে,—বাইরে, যেখানে জ্বলছে অন্ধকার, তার শরীরের মতো অন্ধকার। তারই বিছানার মতো সাদা রঙ। তারই জীবনের মতো তার বিস্তীর্ণ অবিচ্ছিন্নতা। ললিতা নেমে এসেছিলো খাট ছেড়ে, হয়তো দরজাটাও একবার খুলেছিলো। কিন্তু অন্ধকারে ঘরের বাইরে আর সে কোনো পথই দেখতে পায় নি।

পরদিন সন্ধ্যার আগেতেই ললিতা নটুকে বিছানায় দেখতে পেলো। কুঁকড়ে এতোটুকু হয়ে পড়ে আছে।

—এ কী, অসময়ে তুই শুয়ে পড়লি কেন?

—ভীষণ জ্বর এসে গেলো, দিদি। নটুর গলাটা ভারি, আবছা।

—জ্বর এসে গেলো? বলিস কী? ললিতা তার পাশে বসে গায়ে হাত রাখলে: জ্বর হয়েছে, তাই বলে তুই কাঁদছিস কেন?

নটু বালিসে মুখ লুকিয়ে বললে,—মাষ্টারমশাই আজ চলে যাচ্ছেন, দিদি।

—কে চলে যাচ্ছেন?

—মাষ্টারমশাই। কথাটা বলতে নটুর যেন গলা বুজে আসছে।

—চলে যাচ্ছেন মানে? ললিতা চমকে উঠলো: তোকে কে বললে?

—কে আর বলবে! তিনি জিনিস-পত্তর বেঁধে গাড়ির জন্যে বসে আছেন।

ললিতা খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো: একেবারে আজই? কেন যাচ্ছেন কিছু জানিস? বাবা জানেন?

—জানি না। নটু ক্লান্ত, আচ্ছন্ন গলায় বললে, হঠাৎ চলে যাচ্ছেন, দিদি। বাবাকে খুঁজতে গেলাম, বাবা বাড়ি নেই।

—গেলে যাবেন, তার জন্যে তুই এতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ললিতা আঁচলটা গায়ের উপর লতিয়ে দিতে-দিতে দরজার দিকে

অগ্রসর হলো : চেষ্টা করলে আরো কতো ভালো মাষ্টার পাওয়া যাবে।

ললিতা স্খলিত, পিছল পায়ে একেবারে নিচে নেমে এলো। বলা-কওয়া-নেই, একেবারে সৌরাংশুর ঘরে। নটু যা বলেছিলো তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই—সৌরাংশুর বাঁধা-ছাঁদা সব তৈরি।

—এ কী, আপনি কোথায় চলেছেন ?

গলার স্বরটা শীতের হাওয়ার মতো সৌরাংশুর মুখে যেন তীক্ষ্ণ, ঠাণ্ডা একটা ঝাপটা মারলো। ললিতাকে এখানে, এমন চেহারায় দেখবে বলে সে কখনো আশা করে নি। শরীরময় দ্রুততার দীপ্তিতে মৃদু-মৃদু কাঁপছে, চুলে-আঁচলে ঈষৎ.সে উদাসীন, অমনস্ক। ভুরু দুটি অসহিষ্ণু, দুই চোখ অচঞ্চল শুভ্র, সমস্ত মুখে নিরুত্তাপ বিবর্ণতা।

—এ কী, আপনি চলেছেন নাকি কোথাও ?

—হ্যাঁ। সৌরাংশু তার মানিব্যাগের ফোকর দুটো পরীক্ষা করতে লাগলো।

—কোথায় ?

—আপাততো কোনো একটা মেসে। তারপর দেখি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

ললিতা নিষ্প্রাণ গলায় জিগগেস করলে : আপনি চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছেন নাকি ?

সৌরাংশু ম্লান একটু হাসলো ; বললে,—চিরকালে আমি বিশ্বাস করি না। যেতে হচ্ছে, তাই যাচ্ছি। এর বেশি কিছু আর আমার জানবার নেই।

—কিন্তু কেন আপনাকে যেতে হচ্ছে ? ললিতার জিজ্ঞাসাটা প্রায় একটা তিরস্কারের মতো শোনালো।

হাসিটি গাঢ়তায় ম্লানতরো করে সৌরাংশু বললে,—তা আমি নিজেও কি কিছু জানি ?

ললিতার চোখ যেন শুভ্রতায় আরো নিষ্পলক হয়ে এলে ; রুক্ষ, পাথুরে গলায় সে বললে,—যেতে হচ্ছে তো আরো আগে কেন গেলেন না? এ-বাড়িতে হাত-পা আপনার কে বেঁধে রেখেছিলো শুনি?

সৌরাংশু চঞ্চল হয়ে বললে,—আগেই তো যাচ্ছি, যথেষ্ট আগে। আমাদের আসা-যাওয়ার আমরাই তো মালিক নই।

—নয়-ই তো। কথাটাকে প্রাঞ্জল করে দেবার চেষ্টায় ললিতা জিগগেস করলে : কিন্তু বাবা জানেন? বলেছেন তাঁকে?

—দরকার নেই। সৌরাংশু শুকনো মুখে আবার একটু হাসির তরলিমা আনলো : এখানে আসবার আগেই তাঁর অনুমতির দরকার হয়েছিলো, এখন যাবার মুখে আমি স্বাধীন, এ-বাড়ির বাইরে আমার পৃথিবীর অসীমতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

—এই বললেন আমাদের যাওয়া-আসার মালিক আমরা কেউ নই?

—নই-ই তো। ললিতার কথার সুরকে হুবহু নকল করে সৌরাংশু স্মিতমুখে বললে,—ভাগ্যই তো আমাকে ঠেলছে—যে-ভাগ্য আপনাকে একদিন আকস্মিক নিয়ে এসেছিলো এখানে।

ললিতা এক মুহূর্ত থামলো। কথাটাকে যথাসম্ভব ব্যক্তিবিরহিত, প্রাত্যহিক আলাপের অন্তর্ভুক্ত রেখে সে বললে,—কিন্তু আপনার মাইনে-পত্র সব মিটিয়ে নিয়েছেন? বাবা আসুন, ততোক্ষণ দেরি করলে আপনার পৃথিবীর অসীমতা কিছু ফুরিয়ে যাবে না।

—যাবে না। সৌরাংশু গম্ভীর হয়ে গেলো : কিন্তু আমার কী পাওনা ছিলো, কী আমি পেতে পারতাম—ও-সব হিসেব খতিয়ে দেখবার আমার সময় নেই। যেটা আমরা সত্যি পাই না, সেটাও আমাদের জীবনে মস্ত বড়ো একটা পাওয়া হয়ে যেতে পারে।

ললিতা হঠাৎ দুর্বহ ব্যাকুলতায় অবসন্ন হয়ে উঠলো। কি বলবে কিছুই সে খুঁজে পেলো না। বললে,—কিন্তু আজই আপনার

যাওয়া হয় কি করে? নটুর আজ এইমাত্র ভীষণ জ্বর এসে গেছে।

—জ্বর এসে গেছে? সৌরাংশু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে নিমেষে আবার জুড়িয়ে গেলো: তাতে আমার যাওয়া আটকাচ্ছে কী করে? আপনারাই তো সব আছেন, আমি তার কে, আমি তার কী করতে পারি? আমি তো আর তাকে নার্স করবার জন্যে মাইনে পেতাম না।

ললিতার মুখ নীরক্ত, পাংশু হয়ে গেলো। কাতর, অথচ কঠিন গলায় বললে—নিষ্ঠুরতারো একটা সীমা আছে। আপনি তার কেউ না হতে পারেন, কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে সে অসহায়ের মত চোখের জল ফেলছে। চোখের সামনে জল না দেখলে তো আপনারা আর কারুর দুঃখ বোঝেন না, তাই দয়া করে উপরে গিয়ে নটুকে একবার দেখে আসুন। দেখে আসুন আপনাকে সে কতো ভালোবাসে। বলতে-বলতে ললিতারই দু'চোখ অশ্রুর আভাসে অপরিচ্ছন্ন হয়ে এলো।

সৌরাংশু রইলো স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে।

—জ্বরে সে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, আপনি চলে যাবেন বলে একেবারে অসহায়। বলুন, সে তো আপনার কাছে কোনো অপরাধ করে নি। অন্তত তার দুঃখ তো আপনার বোঝা উচিত। লোকে কি খালি পাওনারই হিসেব করে, তার থেকে পাবার কিছু কি কেউ দাবি করে না? নটু-নটুকে স্নেহ করলেও কি আপনার জাত যায়? ললিতার দুই চোখ ঘোলাটে, ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো: সংসারের সমস্ত ভালোবাসাকে আঘাত করতে পারলেই কি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে?

সৌরাংশু নটুর শিয়রে যখন বসলো, তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ললিতা অসুখের যেমন একটা চেহারা দিয়েছিলো, সৌংরাংশুর হাতে জ্বরটা তেমন কিছু ভীষণ মনে হলো না।

ললিতা বললে,—বসুন, বসে থাকুন আরেকটু। জেগে উঠে আপনি সত্যি-সত্যি যান নি শুনলে সে কতো খুসি হবে।

কিন্তু, অলক্ষিতে কী যে ললিতা সেদিন গূঢ় ইসারা করেছিলো, দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহের মধ্যে নটুর জ্বরটা ঘোরালো হতে-হতে দাঁড়ালো গিয়ে টাইফয়েডে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা সৌরাংশু আর ভাবতেও পারলো না। আর, নটুর দিদিকে চাই সব সময়ে হাতের নাগালের মধ্যে। একটু উঠেছে টের পেয়েছে কি, অমনি তার কান্না।

রাত এসেছিলো গভীর করে।

ললিতা বললে,—বাবাকে তুলে দিয়ে আপনি এবার ঘুমুতে যান। সমানে তিন রাত্তির আপনি জাগছেন।

—আর আপনি জাগছেন, রাত দিয়ে সেই অনিদ্রা পরিমাপ করা যাবে না। নটুর মাথার উপর থেকে আইস্-ব্যাগটা কপালের উপর নিয়ে এসে সৌরাংশু বললে,—বরং আপনিই গিয়ে একটু ঘুমুন। এখন বেশ ঘুমিয়েছে, আপনাকে খোঁজ করবে না।

—দরকার নেই, দু'জনেই জেগে থাকি।

ঘরের কোণে মাটির মিটিমিটি একটি বাতি জ্বলে, সমস্ত নিঃশব্দ শূন্য অন্ধকারে থাকে ব্যথার মতো ভার হয়ে। তাদের সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারও থাকে জেগে, শব্দ ভেঙে পড়বার জন্যে উচ্চকিত হয়ে। কেউ তারা কোনো কথা কয় না, দেখতেও পায় না কেউ কাউকে স্পষ্ট করে। সে-অন্ধকারে প্রাত্যহিকতার সকল সীমা, সকল পরিচয় যেন মুছে হারিয়ে একাকার হয়ে যায়। ললিতা যে সজ্ঞানে বেঁচে আছে এই সামান্য কথাটাও সে আর বিশ্বাস করতে চায় না।

অথচ সেই অপরিচিত, সেই বিশাল চিহ্নহীনতায়, মৃত্যুর নিবিড় সন্নিধানে বসে ললিতা কী যেন সেদিন দেখতে পেলো, দেখতে পেলো

তার হৃদয়ের অলৌকিক অন্ধকারে, সৌরাংশুর অশরীরী অস্তিত্বের ধূসরতায়। তার মনে হলো সব যেন দিন-রাত্রির চলমানতায় একেবারে হারিয়ে যায় নি—কী যেন আছে, কী যেন আছে, নিরাপদ, নিভৃত আশ্রয়ের মতো কী যেন আছে স্থির, কী যেন আছে সত্য। তারই সন্ধানে ঘরের মধ্যে বসে ললিতা হাতড়ে ফিরছে এই অন্ধকার, তারই সন্ধানে হয়তো তার স্বামী, মহীপতি, একদিন ঘরের বাঁধন কেটে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলো।

॥ ষোলো ॥

একদিন অভাবনীয় রূপে মহীপতি এসে দেখা দিলো। শরীরে নয়, চিঠিতে।

চিঠিটা ধরণীবাবুকেই লেখা। মোড়কটা খুলে ফেলবার সময়ও তিনি ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেন নি অক্ষরে-অক্ষরে কী আনন্দ সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে, কী আলোড়ন। চিঠিটা এক নিশ্বাসে তিনি পড়ে ফেললেন, পরে প্রত্যেকটি শব্দ ধরে-ধরে তীক্ষ্ণ চোখে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশ্যে যেটুকু লিখিত তার অন্তরালে নিহিত অনেক নিঃশব্দতার ঢেউ মেপে,—কিন্তু প্রথমটা তিনি কোনো তার ধারাবাহিক অর্থ করতে পারলেন না। মহীপতি চিঠি লিখেছে! এ কখনো সত্যি হতে পারে, আছে এর মধ্যে কোনো পারম্পরিক সম্ভাবনা? অনেক সন্দেহ, অনেক জিজ্ঞাসা—ধরণীবাবু আনন্দে, অবিশ্বাস্য অসহ্য আনন্দে দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন। সামান্য ক'টি লাইন, নির্ভুল, নিঃসংশয়: প্রচ্ছন্ন উচ্চারণে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট, নিরাবরণ, প্রখর সারল্যে প্রত্যেকটি অর্থ তরোয়ালের ফলার মতো ঝকঝক করছে। তিনি তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। মহীপতি চিঠি লিখেছে, মহীপতি—তার দেশের বাড়ি থেকে, টিকিটের উপর ডাকঘরের সেই মোহর,—দু'দিন আগেকার সেই তারিখ, এই তার হাতের লেখা—স্বয়ং ললিতাও যা কোনদিন দেখে নি। এর মাঝে কোথায় যেন একটা ছন্দোহীন আকস্মিকতা ছিলো। তবু এ তারই চিঠি, সমস্ত সংবাদে সে-ই রয়েছে জাজ্বল্যমান হয়ে, তার অনস্বীকার্য্য আশরীর বিদ্যমানতা। লিখেছে—এ ছাড়া কী-ই বা আর সে লিখতে পারতো—সামান্য, সংক্ষিপ্ত ক'টি লাইন, লিখেছে: সম্প্রতি সে দেশে ফিরেছে, কলকাতায় আসছে পনেরোই, মানে কাল সকালে। তার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন,

প্রধানতঃ চিকিৎসার জন্যেই তার আসা। শ্বশুরবাড়িতেই সে এসে উঠবে অবিশ্যি—এ-কথা বিশেষ করে তার লেখবার কিছু দরকার ছিলো না। আশা করি বাড়ির সবাই বেশ ভালো আছেন। একা ধরণীবাবুর গৌরবেই বহুবচনটা ব্যবহার করা হয়েছে, তা না-ও হতে পারে—দুর্নিরীক্ষ্য এক সঙ্কেতে ধরণীবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

খবরটা তিনি অনেকক্ষণ কারু কাছে ভাঙলেন না। যতই সময় যেতে লাগলো, সময় এখন তরল জলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে—ততই তিনি খবরটা বিশ্বাস করতে লাগলেন, যেন প্রত্যাশিত প্রাত্যহিক একটা ঘটনার টুকরো, যেমন আজকে আবার সূর্য উঠেছিলো, যেমন রোদের দিকে গাছ তার পাতাগুলি মেলে ধরেছে, যেমন আকাশে ছড়িয়ে আছে নীল নীরবতা। বাস্তবিক, এতে এমন চমকে ওঠবার কী ছিলো কে বলবে? এ তো ঘটতোই, এ ঘটবে বলেই তো মরা, লালচে, পাতার মতো ঝরিয়ে দিতে হয়েছিলো এতোগুলি দিন-রাত্রির দীর্ঘশ্বাস, এ ঘটবে বলেই তো আকাশে সূর্য এতোদিন অপেক্ষা করেছে, এতো অন্ধকারেও রাত্রিগুলি ক্ষয় হয়ে যায় নি। যতোই সময় যেতে লাগলো, ধরণীবাবু এর মাঝে আর একবিন্দু অভাবনীয়তা খুঁজে পেলেন না, এ যেন তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন: শীতের ধূমলতার পব বসন্তের এই বিদারিত নীলিমা। এতোদিন তিনি যেন কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটছিলেন; আজ এতোদিনে, মাটিতে ফেললেন পা, তাঁর সাংসারিক পরিমিতিতে—এর মাঝে অলৌকিক কিছু নেই, মহীপতির ফিরে আসাটা সময়ের সমুদ্রে ঋতুর পুনরাবর্তনের মত, কবিতায় এক শব্দ থেকে অন্য শব্দের সহজ সংক্রমণের মতা নির্দিষ্ট, নির্ধারিত,—জাহাজের যেমন বন্দর, স্রোতের যেমন তীর—খবরটা এমন কিছু আর আকাশ থেকে পড়ছে না!

নিচে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, আবছা চোখে পড়লো ললিতা তার ঘরে পাইচারি করতে-করতে শিথিল, স্তিমিত ক'টি আঙুলে চুলের

বেণী খুলছে। ধরণীবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ললিতার চেহারায় কেমন একটি নিরাভ ঔদাসীন্য, যেন নিস্তেজ বিশীর্ণতার একটি ধারা, কোথাও তার শরীর নয় শিহরিত। দহমান, উজ্জ্বল একটা শিখাকে নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে যদি তাকে আঁকা যেতো তবে তা প্রাণময় হয়ে উঠতো ললিতার এই শীতল বিষণ্ণতায়। দেখে ধরণীবাবুর ভারি মায়া করতে লাগলো, খবরটা এখুনি তাকে না জানালেই নয়।

তাঁর ইচ্ছা ছিলো কাল সকালেই যখন মহীপতি আসবে, তখন, একেবারে সেই সময়ই ললিতা জানবে, খবরটা তার উপর ভেঙে পড়বে উচ্ছল, ফেনিল, প্রবল একটা ঢেউয়ের মতো। তাকে এতোটুকু কোথাও প্রস্তুত হতে দেবে না, রাখবে না এতোটুকু পালাবার কোনো অন্তরাল। অপ্রতিরোধ্য, অনাবৃত একটা উপস্থিতি। যেন মহীপতি একান্ত করে ললিতার কাছেই ফিরে আসছে, নেই এর মাঝে আর কোনো সাংসারিক ষড়যন্ত্র। খবরটা যেন সে-ই প্রথম জানতে পারলো, আবিষ্কার করলো সে-ই তার জীবনের নতুন মহাদেশ। কিন্তু ললিতার এই মলিন ম্রিয়মানতা দেখে তিনি আর দেরি করতে পারলেন না, চুলগুলিতে সেই উজ্জ্বল ঘনতা নেই, কপালটা রুক্ষ, চোখের কোল ঘেঁসে নমিত পল্লবের গভীর ছায়া পড়েছে, কাঁধ দু'টি কেমন শিথিল, দুই হাতে এত রিক্ততা সে আর বইতে পারছে না, পরনের শাড়িটাতে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরের ধূসরতা—ধরণীবাবু পারলেন না আর খবরটা চাপা দিয়ে রাখতে; সত্যিকারের যে আর্ত্ত, তার জন্যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত না রেখে উচিত তার উপস্থিত উপশম করা। ধরণীবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

গলা তাঁর কথা বলতে গিয়ে সাদা থাকলো না অবিশ্যি। ঈষৎ উত্তপ্ত, গাঢ় গলায় বললেন,—খুব একটা ভালো খবর আছে, ললিতা।

ললিতার লতানো আঙুলগুলির মধ্যে ছিন্ন বেণীটা কেঁপে উঠলো

চারদিকে যেন সে রাশি-রাশি জল দেখছে এমনি চিহ্নহীন, অপার চোখে সে চেয়ে রইলো।

ধরণীবাবু বললেন,—মহীপতির হঠাৎ আজ একটা চিঠি পেলাম।

খবরটা শুনে তাঁর চোখের সামনে ললিতা রাতের নদীর মতো আনন্দের অন্ধকারে ঝলমল করে উঠবে বা সূর্য্যালোকে নিষ্কাশিত অসির শাণিত শীর্ণতার মতো, তেমন কিছু তিনি স্পষ্ট আশা করেন নি। কিন্তু খবরটার মধ্যে এমন একটা বিহ্বল মাদকতা ছিল, এটুকু তিনি অন্তত ভেবে রেখেছিলেন, দেখতে-দেখতে ললিতা সর্ব্বাঙ্গীণ সুরভিত হয়ে উঠবে, তিনি তা আর প্রথম নিশ্বাস নেয়ার মুহূর্তে বাতাসে অনুভব করতে পারবেন। দেখতে-দেখতে তার কপালে একটি স্নিগ্ধ প্রশান্তি ফুটে উঠবে, চোখের প্রখর শুভ্রতা উঠবে লজ্জায় কোমল হয়ে, তার পাণ্ডুর মুখের উপর ফুটবে একটি সদ্যোজাত কিশলয়ের শ্যামলতা, তাকে তিনি আর খানিকক্ষণ চিনতে পারবেন না।

কিন্তু ললিতার মুখ দেখে তিনি শুকিয়ে গেলেন। যেন ডুবন্ত জাহাজে সে পা রেখেছে, এমন ভীত, সর্বহারা মূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ কার ?

—মহীপতির। সে এখানে আসছে, কাল, কাল সকালে। আমি যেন এখনো তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না।

—এখানে, এখানে আসছে মানে ? ললিতা দুই হাতে শক্ত করে তার চুলের স্খলিত গুচ্ছটা টেনে ধরলো : আমাদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই বৈ কি। ধরণীবাবু পাংশু মুখে হেসে উঠলেন : নইলে কলকাতায় এসে সে আর কোন বাড়িতে উঠবে ? আমরা ছাড়া এখানে তার কে আত্মীয় আছে ?

যেন কোন পবাক্রান্ত আততায়ীর সম্মুখীন হচ্ছে, নিরস্ত্র অথচ নিষ্ঠুর, ললিতা কণ্ঠস্বরে তেমনি প্রতিবাদ করে উঠলো : কিন্তু কেন সে আসছে শুনি ?

কেন যে আসছে কারণটা ধরণীবাবুও এতক্ষণ ভুলে ছিলেন। এখানে সে আসছে, এর আবার একটা স্পর্শসহ কারণ দিতে হবে নাকি—এখানে সে আসছে, শুধু এইটেই কি তার ফিরে আসার যথেষ্ট কারণ নয়? ধরণীবাবু তবু একটা ঢোঁক গিললেন, বললেন,—লিখেছে তার নাকি কি অসুখ করেছে, চিকিৎসার দরকার—

ললিতা কথার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো: চিকিৎসার দরকার তো এখানে কেন? আমরা কি এখানে রুগীর জন্য হাসপাতাল খুলে বসেছি নাকি?

—তুই এ কী বলছিস, ললিতা? ধরণীবাবু তার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো চেয়ে রইলেন: মহীপতি আসছে, আর কেউ নয়, স্বয়ং মহীপতি, যার জন্যে এতোদিন ধরে আমরা পথ চেয়ে বসে আছি—যার জন্যে—কথাটাকে সর্ব্বাঙ্গীণ আয়ত্ত করতে গিয়ে ধরণীবাবু একেবারে ছেলেমানুষের মতো উথলে উঠলেন: ঈশ্বর তা হলে এতোদিনে মুখ তুলে চাইলেন, ললিতা! এ কি কখনো মিথ্যে হতে পারে, এত নিষ্ঠা, এত দুঃখ? তুই তো কোনো অপরাধ করিস নি।

—কিন্তু তাই বলে এখানে সে আসবে কেন? ললিতা যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখলে।

—বা, এখানে আসবে না? এখানে আসবার জন্যেই তো সে আসছে এতোদিনে। ধরণীবাবু দার্শনিকের মতো নির্লিপ্ত, নিটোল গলায় বললেন,—আসতে যে তাকে হতোই। জলে যতোদিন জোয়ার-ভাঁটা আছে, আকাশে আছে যতদিন দিন-রাত্রি, সে যাবে কোথায়, যাবে কোথায় সে এ চক্রান্ত এড়িয়ে? পৃথিবী তো আর মিছিমিছি ঘুরছে না।

আনন্দের আকস্মিক আতিশয্যে ধরণীবাবুর কথাবার্তা প্রায় ভাবাতুর কাব্যের পর্যায়ে এসে যাচ্ছিলো, কিন্তু ললিতা এক নিমেষে তাকে নামিয়ে নিয়ে এলো কঠিন, অচল বাস্তবতায়। ললিতার নির্বাপিত, শিতল মুখ শুকিয়ে শীর্ণ, ধারালো হয়ে এলো, তার সমস্ত

ঘৃণা ও রুক্ষতা এসে দাঁড়ালো তার দুই চোখে ; সে স্পষ্ট, কঙ্কালের মতো দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—না। পৃথিবী ঘুরুক্ বা না-ঘুরুক্, এখানে, এ-বাড়িতে ঢোকবার তার আর অধিকার নেই।

—অধিকার নেই? ধরণীবাবু গর্জে উঠলেন: তুই তার স্ত্রী।

—সেই কথা এতোদিন পরে তার মনে পড়লো বুঝি? ললিতা ঘুরে দাঁড়ালো: যখন সে আমাকে একদিন পুরোনো, বাসি খবরের কাগজের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো, তখন আমি তার কী ছিলাম?

—কিন্তু সে তো ফিরে আসছে শেষ পর্যন্ত। অসুখই হোক বা যাই হোক, আসছে তোরই কাছে, একান্ত করে তার স্ত্রীর কাছে। ধরণীবাবু গলার স্বর স্নেহে আবার নরম করে আনলেন: তোরই প্রতীক্ষা, তোরই তপস্যা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হলো, ললিতা।

ধরণীবাবু চলে যাবার উদ্যোগ করছিলেন, ললিতা তাঁর মুখের উপর কথার কতোগুলি তীক্ষ্ণ, আগ্নেয়-উজ্জ্বল বাণ ছুঁড়ে মারলো: আর আমি? আমি যদি একদিন এমনি অনায়াসে, এমনি বিবেকহীন নির্মমতায় বেরিয়ে পড়তাম ও আসতাম পরাজিত হয়ে ফিরে, আমার মহামান্য স্বামীর আশ্রয়ে, সে আমাকে সেদিন হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতো হাসিমুখে? থাকতো সে আমার প্রতীক্ষা করে, সেদিন আমার অভ্যর্থনায় খুলে দিতো সে তার ঘরের দুয়ার?

—কিন্তু সে তো আর শুধু-শুধু বেরিয়ে যায় নি। ধরণীবাবু ফিরে এলেন: তার জীবনে বৃহত্তর এক সত্যের সন্ধান এসেছিলো। হয়তো সে-সন্ধান এসে এতোদিনে পরিণতি পেয়েছে, তার স্ত্রী-তে, তার গৃহানুরাগে।

—তার সৌভাগ্য। ঘৃণায় ললিতার দুই ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে উঠলো: কিন্তু আমার সেদিনের সত্য নিশ্চয়ই কখনো এতো বড়ো অর্থ নিয়ে দাঁড়াতো না, বাবা। আমি সেদিনো সেই বাসি, পুরোনো খবরের কাগজের মতোই প্রত্যাখ্যাত হতাম।

—কিন্তু সেইদিক থেকে তোর তো কিছুই অভিযোগ করবার থাকতে পারে না। সে ছিলো সন্ন্যাসী, সাধু, চরিত্রগৌরবে বহ্নিমান।

—মিথ্যা কথা। ললিতা সমস্ত স্নায়ু-শিরায় ধিক্কার দিয়ে উঠলো : তার চেয়ে, তার চেয়ে মুক্ত, স্পষ্ট, প্রাণবান অসচ্চরিত্রতায়ো ঢের বেশি মহত্ত্ব আছে।

—কিন্তু মানুষের ভুল তো একদিন ভেঙে যেতে পারে, ললিতা। ধরণীবাবু প্রশান্ত গলায় বললেন,—সেই স্বাধীনতা তো জোর করে কারুর কাড়বার ক্ষমতা নেই।

—নেই, কিন্তু ভুল কারুর সংসারে একলাই ভাঙে না, বাবা। ললিতার সর্বাঙ্গ হঠাৎ বেদনায় অবসন্ন হয়ে এলো, নিস্তেজ হয়ে এলো তার দাঁড়াবার সেই প্রখর ঋজুতা, তার কঠিন মুখের শাণিত রেখাগুলি ধীরে-ধীরে এলো ধূসর, স্তিমিত হয়ে ; সে আর্দ্র, প্রায় রুদ্ধ গলায় বললে,—তেমনি আমারো স্বাধীনতা আছে, ভুল ভাঙবার, ভুল করবার, অখণ্ড অজস্র স্বাধীনতা। আমার সে-স্বাধীনতাও কেউ কাড়তে পাবে না।

—তুই, তুই কী করবি ? ধরণীবাবু যেন হাঁপিয়ে উঠলেন : তুই কী করতে পারিস বোকা মেয়ে ?

—আমি কিছুই করতে পারি না, না ? ললিতা দুই হাতে মুখ ঢাকলো যেন তার অনপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস, উঠলো সে কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে : আমি একটা পথের আবর্জনা, আমি মানুষ নই, আমার জীবনে কোনো উপলব্ধি, কোনো অন্বেষণ থাকতে পারে না, ইচ্ছেমতো যে খুসি আমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে পারে। আমার নিজের কোনো মেরুদণ্ড নেই, আমি খামখেয়ালি পরের হাতে খেলার একটা পুতুল হয়ে আছি মাত্র, দড়িতে টান দিলে আমি দাঁড়াই, দড়িতে ঢিল দিলে আমি বসে পড়ি।

খবরটা শুনে দীপ্তিতে ললিতা সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে তা ধরণীবাবু আশা করেন নি বটে, কিন্তু এমন একটা বিয়োগান্ত

অভিনয়ের পরিকল্পনাও তাঁর দুঃস্বপ্নের অগোচর ছিলো। অভিনয় ছাড়া আর কী হতে পারে। নিতান্ত একটা তরল নাটুকেপনা। নইলে, সংসারে কোথায় তার স্থান, কিসে তার সমারোহ, এ-কথা কোন পতিবত্নী মেয়ে না উপলব্ধি করতে পেরেছে সশরীরে। অগত্যা ধরণীবাবু ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলেন। বললেন,—তোকে আবার এ কী পাগলামি ধরলো, লিলি। এমন একটা সুখবরে খুসিতে কোথায় উছলে পড়বি, না, তুই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিস?

—না, কই আর কাঁদছি। আমার কাঁদবার দিন নাকি? ললিতা মুখটা মুছে বিবর্ণ, সাদা করে তুললো।

—সে এখনো বেঁচে আছে, আমাদের সে আজো ভোলে নি, তার জীবনে এসেছে নতুন পরিবর্তন, ধরণীবাবু আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠলেন: এমন দিনে ঈশ্বরকেই মনে পড়ে, ললিতা।

—আমারো মনে পড়ে ঈশ্বরকেই। ললিতা পাংশু মুখে প্রেতায়িত হেসে উঠলো: আমিও এখনো বেঁচে আছি, বাবা, আমিও কিছু ভুলি নি। পৃথিবী অনেক পথ ঘুরে এসেছে, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আর এক জায়গায় থেমে নেই।

—নেই তো নেই। চান করতে যাচ্ছিস তো চট্ যা করে। ধরণীবাবু নিজেই অগ্রসর হলেন: সেই দিনের এক ফোটা মেয়ে, লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিতে শিখেছে দেখ। ওঁর আবার পরিবর্তন হয়েছে। এতোদিন পরে স্বামী ঘরে ফিবে আসছে, ওঁর হয়েছে পরিবর্ত্তন। পাগলামি করার আর তুই সময় খুঁজে পেলি না? বলেই আবার তিনি হাসিতে উৎসারিত হয়ে পড়লেন।

—ঠিকই তো, ললিতা নিরুদ্বেগ, নিম্ন কণ্ঠে বললে, যেন নেপথ্য থেকে: আমরা বদলাবো কেন, আমরা যে পাথর। যার খুসি পাথরকে পূজো করে, যার খুসি ছুঁড়ে দেয় পথের ধূলায়। আমরা বদলাবো কেন, বেশ, চিরকাল আমরা পাথর হয়েই থাকবো।

ধরণীবাবু তার কথা আর কানে তুললেন না। গভীর বিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন হাসি হেসে স্বচ্ছন্দে নিচে নেমে গেলেন।

বিশাল, নিরবয়ব, নিশ্চল স্তব্ধতা ললিতাকে অণুতে-পরমাণুতে গ্রাস করে ধরলো। সত্যি, পৃথিবী যেন আর চলছে না, সময় রয়েছে গতিরোধ করে, তার নিজের এই অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন তার নিশ্বাসে রয়েছে রুদ্ধ, স্তম্ভিত। এ-মুহূর্তে তার জন্যে আর কোনো আশ্রয় নেই, আবরণ নেই, সে যেন চলে এসেছে তার অনস্তিত্বের শুভ্রতায় বস্তুহীন, শূন্যায়িত আকাশে। যেন তার বুকের থেকে উত্তপ্ত হৃৎপিণ্ডটা খসে পায়ের তলায় পড়ে গেছে—সমস্ত শরীর ভরে সে এত অসহায়, এত দুর্বহ। শৃঙ্খলিত যে পশু, তার মাঝেও এর চেয়ে বেশি দীপ্তি থাকে, তার দুর্নমনীয় বিদ্রোহের দীপ্তি : তার পরাভবে থাকে এরচেয়ে অনেক বেশি মহিমা। শিকারীর মুঠোর মধ্যেও পাখি তার পাখা ঝাপটায়। তরল যে জল, সে-ও বাধার বিরুদ্ধে উচ্ছল হয়ে ওঠে। শুধু সে-ই নিতান্ত নিরীহ, একতাল কাদার চেয়েও নমনীয়, প্রাণীজগতে সে-ই শুধু সেই স্তরে নেমে এসেছে যাদের দেহে আর রক্ত নেই, যারা আত্মরক্ষার জন্যে দংশন পর্যন্ত করতে জানে না।

আঁচলের স্তূপে মুখ লুকিয়ে ললিতা আবার কেঁদে উঠলো। কেন, কেন সে ফিরে আসবে, কোন নিয়মে, কোন অধিকারে? চলেই যদি সে যেতে পারলো, পিছনের সমস্ত পথ তার পায়ে-চলার উড়ন্ত ধূলিতে কেন মুছে দিয়ে গেলো না? সে যখন যেতে পেরেছিলো, তখন ললিতাই শুধু পৃথিবীতে একা থেমে ছিলো নাকি? তার জন্যে আর কোনো ছিলো না পথ, ছিলো না কোনো পান্থশালা? সে-ই যেন শুধু তার স্মৃতির ছায়ায় বসে রাত্রিদিন ধরে সুখ-স্বপ্নের রঙিন আলো জ্বেলে বসে আছে। আজ একযুগ পরে সেই প্রতীক্ষমান পরিচিত আলোয় পথ চিনে-চিনে, নির্ভুল অশঙ্কমান নিশ্চিন্ততায় সে ফিরে আসছে। ললিতাকে ভোলে নি, ললিতার জন্যেই সে

এতোদিন বেঁচে ছিলো। ললিতা আজো তার জন্যে রচনা করে রেখেছে আরাম-রমণীয় নিবিড় সুখ-শয্যা, সর্বাঙ্গ ঘিরে দহমান যৌবনের আরতি। তার সমস্ত সন্ধান, সমস্ত জিজ্ঞাসা আজ এসে শেষ হলো ললিতার সমৃদ্ধ শারীরতায়, আজো যা তার স্পর্শের স্বপ্নে শিহরায়মান, আজো যা তার সান্নিধ্যের তৃষ্ণায় হাহাকার করছে। ললিতার সমস্ত শরীর পিচ্ছল ঘৃণায় ক্লেদাক্ত হয়ে উঠলো। ললিতাকে আজ তার দরকার পড়েছে, তার কাছে আজ চাই তার নমনীয় সুষমা, স্নেহের গলিত নির্ঝরিণী, দুই হাতে চাই তার অজস্র দিৎসা, অকৃপণ সেবমানতা : তার ঈশ্বর আজ বাসা নিয়েছে এসে ললিতার মৃন্ময় সীমাবদ্ধতায়, সে-ও অমনি কিনা তার নিভৃত ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। হায়, কেবল ললিতারই কোনো ঈশ্বর নেই। সে শুধু তার পূজার একটা অকিঞ্চিৎকর উপকরণ, তার সার্থকতা শুধু সেই প্রাণহীন উৎসর্গে, মলিন অপ্রতিবাদ মৃত্যুতে। বিষাক্ত ঘৃণায় ললিতা আপাদমস্তক জর্জর হয়ে উঠলো তার এই পাতিব্রত্যের ভার ক্লান্তিকর অশুচি একটা গ্লানির মতো তাকে অন্তরে-বাহিরে অপরিচ্ছন্ন করে তুলেছে।

বরং, মহীপতিকে সে কতো শ্রদ্ধা করতো মনে-মনে তার সেই কঠিন নিষ্ঠুরতায় সেই দুর্জয় প্রত্যাখ্যানে। সেই নিষ্ঠুরতা, ও ত্যাগে সে ছিলো দুস্পৃশ পুরুষ, বলোজ্জ্বল, স্পর্দ্ধা-উদ্ধত, তার সেদিনকার তিরোধানে ছিলো সে অনেক জ্যোতির্ময়। ললিতার চোখের সামনে পূজার ঘরে মহীপতির সেই ধ্যানাসীন প্রশান্ত মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তার সেদিনকার বসবার তন্ময় ভঙ্গিতে ছিলো অবিচল ঋজুতা, নিস্পৃহ, নিরাকুল চোখে ছিলো উপলব্ধির গাম্ভীর্য, সমস্ত শরীরে সে যেন ছিলো এক দেহাতীত বিস্ময়, অলৌকিক আবির্ভাব। কতোদিন কতো ফাঁকে ললিতা তাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখেছে। সে ছিলো সেদিন এক শীততুষারহীন আগ্নেয় পর্বত, স্নেহে একাদনো সে গলে না এলেও-তার সেই মহান নির্মমতার অনেক বেশি

আস্বাদ ছিলো, অনেক বেশি ঐশ্বর্য। আজ তাকে নিতান্ত লোভী, ভিক্ষুকের মতো মনে হচ্ছে। সে, সে-ও কিনা অবশেষে তার সেই দৃপ্ত পরুষতা, সেই বলীয়ান বৈরাগ্য, মিনতিতে নরম করে আনলো ললিতার দুয়ারে, তার হাতের দুটি আর্দ্র সেবা পাবার জন্যে, পেতে তার দুটি ভীরু উত্তাপ, শরীরময় গাঢ় একটি বনচ্ছায়া। আর ললিতা কিনা আজো তার অস্ফুট ইঙ্গিতের প্রত্যাশায় প্রতিধ্বনিমান, সেই নববধূর নিমীলিত সৌরভ নিয়ে আজো কিনা সে শয্যায় সঙ্কীর্ণ প্রান্ত ঘেঁসে শুয়ে আছে, অস্তমান চাঁদের মতো নিরাভ। যতো তার আলো সব যেন তার স্বামীর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে, যতো তার পিপাসা সব যেন তারই পিপাসা থেকে। ললিতা আপনমনে বিশীর্ণ মুখে হেসে উঠলো। এরই নাম প্রেম, এরই নাম পাতিব্রত্য!

ধরণীবাবু উপরে যখন উঠে এলেন, ললিতা তখনো দেয়ালের ধারে রেখায়িত একটা কঙ্কালের মতো বসে আছে। তিনি তার এই নিষ্প্রভ ঔদাস্য আর সইতে পারলেন না। বিরক্ত মুখে ধমকে উঠলেন: কী তুই এখনো বসে আছিস চুপ করে? এমন মুখ করে আছিস যেন কী তোর ভয়ানক রাজ্যপতন হয়ে গেছে! কোথায় তুই স্ফুর্তিতে উছলে পড়বি, তা নয়, আছিস মন-মরা হয়ে বসে? এই শুভসংবাদের জন্যেই কি তুই এতোদিন এইখানে বসে প্রতীক্ষা করছিলি না? নে ওঠ, চান করে খেয়ে-দেয়ে নে, এই সব বিশ্রী সাজগোজ ছেড়ে দিব্যি লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠ।

—এই উঠছি। ললিতা সারা শরীরে দুর্বল, ভঙ্গুর ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ালো।

ধরণীবাবু তার দিকে মহীপতির চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলেন: এই ছাখ তার চিঠি, চিঠি খুলবার সময়ো ভাবিনি আমি এ পড়বার জন্যে বেঁচে থাকবো, স্বচক্ষে দেখবো এই মহীপতির হাতের লেখা। নে, পড়ে ছাখ চিঠিখানা।

ললিতা নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—পড়ে দেখবার কী আছে? শুনলামই তো সমস্ত।

—শুনলি তো অমন উপোসীর মতো চেহারা করে আছিস কেন?

—আগে চান করে খেয়ে-দেয়ে নি, তবে তো সাজবো। ললিতা বিশীর্ণ একটু হাসলো: সে তো আসছে কাল ভোরে।

—সাজবি না তো বিবাগীর মতো এমনি হতচ্ছাড়া বেশবাস করে থাকবি নাকি? সংসারে তোর মা নেই বলে আমার ওপর এমনি তুই শোধ তুলবি নাকি, লিলি? তুই নিজে কিছু বুঝিস না, বুঝিস না, কোথায় মেয়েদের ঐশ্বর্য, কিসে তাদের সার্থকতা?

—সংসারে মা নেই বলে সত্যি করে তুমিই তো তা বোঝাতে পারো বাবা, তোমার এই নিষ্ঠায়, তোমার এই ত্যাগে। ললিতার গলা ভারি, আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

—তেমনি তুইও বোঝাবি। ধরণীবাবু ললিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

সন্ধের দিকে আপিস থেকে ফিরে এসে ললিতার চেহারা দেখে ধরণীবাবুর আর পলক পড়তে চাইলো না। উদগ্র প্রসন্নতায় ললিতা আপাদমস্তক বন্য, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গে বিস্তীর্ণ করে জড়িয়েছে এলোমেলো সবুজ একটা শাড়ি, বৃষ্টিসিঞ্চিত মাঠের প্রগলভ শ্যামলতা। একটি-একটি করে গায়ে দিয়েছে তার সমস্ত গয়না, জ্বলন্ত সোনায় সমস্ত গা তার দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছে কালো চুলের ফেনিলতা। বর্ষমাণ তরল জলধারাব মতো সে মুখর হয়ে উঠেছে, আনন্দের দ্যুতিতে ছিটিয়ে পড়েছে সে বাড়ির এখানে-সেখানে, উপর-নিচে, কাজে-অকাজে, সংসারে নানা প্রকার তুচ্ছতায়। আর নেই তার একবিন্দু ধূসরতা, শীতস্পৃষ্ট বনের বৈরাগ্য: মৃতপত্র অরণ্যে বসন্ত-বিদারণের মতো সর্বাঙ্গে উঠেছে মর্মরিত হয়ে। নিজের মাঝে নিজে যেন সে আর আঁটছে না, উথলে পড়ছে তার বিলাসের নির্লজ্জতায়, তার সমারূঢ় সজ্জার সম্ভারে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সে বিন্দুতম সিঁদুর পরছিলো সূক্ষ্ম চোখে—তার প্রসাধনের শেষ মুদ্রা, পিছনে ধরণীবাবুর পা শুনে সে ঘুরে দাঁড়ালো বিলোল গ্রীবা হেলিয়ে ; বললে,—চমৎকার সাজি নি, বাবা ?

বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের অস্পষ্ট একটু আভা এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সেই ঘোলাটে অপরিচিত আলোয় ধরণীবাবু চমকে উঠলেন, তাঁর সামনে শ্লথদেহ, দীর্ঘ, সবুজ একটা সাপ যেন প্রসারিত আলস্যে হঠাৎ ঝলমল করে উঠেছে। ললিতা আবার বললে,—চমৎকার সাজি নি, বাবা ? ও কী, আমাকে তুমি চিনতে পারছো না নাকি ? ললিতা উৎস-উত্থিত প্রবল নির্ঝরজলের মতো হেসে উঠলো। সেই হাসিও যেন ধরণীবাবু চিনতে পারছেন না।

বলতে কী, এতোটা তিনি আশা করেন নি। চমৎকারই বটে, অসহনীয় চমৎকার ? সুখে ও সম্পদে ললিতা যেন মাতাল হয়ে উঠেছে, চেপে রাখতে পারছে না তার উচ্ছৃঙ্খল মেয়েলিপনা। তবু কী জানি কেন, তিনি এখন, এ-মুহূর্তে, আর বিজ্ঞের মতো হাসতে পারলেন না, তাঁর ভয় করতে লাগলো। এত প্রাচুর্য যেন চোখ ভরে দেখা যায় না, বিশেষ করে আনন্দের প্রাচুর্য,—এর মাঝে কোথায় যেন মুমূর্ষু শিখার অন্তিম বিস্ফারণের ইসারা।

তবু তিনি স্মিতমুখে এগিয়ে গেলেন ; ললিতার সলজ্জ-উচ্ছল চিবুকটি তুলে ধরে স্নিগ্ধ গলায় বললে,—চমৎকার। কিন্তু এখন থেকেই এতো সাজগোজ কেন, মা ? সে তো আসছে কাল ভোরে।

—কাল ভোরে নাকি ? ললিতা নিজের দিকে চেয়ে কুটিল একটা কটাক্ষ করলো : তা হলোই বা কাল ভোর, মাঝখানে আজকের রাতটা তো আছে, কালকের ভোরের জন্যে আজকের রাতটা তো আর পালিয়ে যায় নি।

চান্দ্রমসী নিশীথ রাত্রির মতো ললিতা উঠলো বিহ্বল হয়ে।

আজকের রাতেই যেন তার সে মৃত অতীতের সুন্দর চিতারচনা

করেছে। কিন্তু তবু ধরণীবাবুর যেন ভয় করতে লাগলো, ললিতার চারপাশে তিনি পরিমিত সংসার-পরিবেশের স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেলেন না। আনন্দে সে কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছে, তার সৌন্দর্যটা কেমন পাশবিক, অরণ্যলালিত। এখন তাকে প্রায় একটা বিচিত্রিতা বাঘিনীর মতো দেখাচ্ছে—সর্বাঙ্গে তেমনি তার মহিমার ব্যঞ্জনা, দ্যুতিমান ক্ষিপ্রতা, তেমনি দুঃসহ দুঃসাহস।

কাল ভোরের জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

॥ সতেরো ॥

খবরটা সৌরাংশুর কানে পৌঁচেছিলো, মহীপতির আকস্মিক ফিরে আসার খবর—আর তারই হাওয়ায় ললিতা কেমন সমস্ত দেহে হাজার প্রজাপতির রঙচঙে পাখা মেলে দিয়েছে, তারই ত্ব-একটা অস্ফুট গুনগুনানি। সাজলে যে মেয়েদের কতো কুৎসিত দেখায়, সৌরাংশু জীবনে এই প্রথম দেখলো। ললিতাকে যে মোটেই মানায় না এই উচ্চণ্ড সমারোহে, দীর্ঘ দীপ্ত তরবারির মতো এই উদগ্র উন্মোচনে, সে-কথা তাকে কে বোঝাবে? এতো আচ্ছাদিত হয়েও সে কেমন নিরাবরণ, শুভ্রায়িত সমাধিস্তূপের মত; এত প্রকাশমান সৌন্দর্যের উপকরণেও তাকে কেমন দরিদ্র, নিঃস্ব দেখাচ্ছে। আর কেনই বা তার এত আস্ফালন, এই উদ্দাম পাখা মেলে দেয়া? কারণটা ভাবতেও সৌরাংশুর গা গুলিয়ে উঠতে থাকে, মনের অপরিচ্ছন্ন একটা আবহাওয়ায় এসে সে আর নিশ্বাস নিতে পারে না—অথচ তারো বা যে কী কারণ দেবতারাও বলতে পারে না। বহুবিলম্বিত বিরহের পর দূর অজ্ঞাতবাস থেকে স্বামী ফিরে আসছে, তার স্ত্রীর নিবিড় নিভৃতিতে, এতে কোন স্ত্রী না বহুবিসর্পিণী নদীর মতো মোহনার কাছে এসে উন্মুখর হয়ে উঠবে! এতে আশ্চর্য হবার আছে কী! এই তো স্বাভাবিক। আষাঢ়ে নতুন মেঘ দেখলে ময়ূরের পেখম মেলে ধরা, চাঁদ দেখলে সমুদ্রের সমস্ত শরীরে নীল-ফেনিল হয়ে ওঠা। তবু, হোক স্বাভাবিক, তবু ললিতাকে যেন এ মানায় না। অপরাহ্নের ক্ষণকালিক ধূসরতার মুহূর্তে ঘরে বসে জ্বালাই না আমরা কেউ বিদ্যুতের আলো, ঘরে প্রথম রোদ এসে পড়লে গত রাতের বাসি বাতির মুমূর্ষুতাটা আমাদের চোখে বীভৎস লাগে। তাকে মানায় না

এত সুখ, এত তার মদির কলধ্বনিমানতা, এত তার উচ্ছলিত চাপল্য—সংসারে কাউকে-কাউকে মানায় না, কী করা যাবে, সৌরাংশুর চোখে ললিতা তাদেরই বিরল একজন।

বরং, ঘরের দরজা ভেজিয়ে মধ্যরাত্রের সতেজ অন্ধকারে বসে সৌরাংশু ভাবছিলো, বরং সেই নটুর সেই রুগ্ন, মলিন শয্যার কিনারে বিষণ্ণ নিস্তব্ধতায় তাকে কতো বেশি সুন্দর দেখাতো, কতো বেশি সম্পূর্ণ। ঘরে আলো প্রায়ই জ্বলতো না, জ্বললেও মোমবাতির নরম, হলদে একটি শিখা, তরলায়িত অন্ধকারে ললিতা সৌরাংশুর চোখের অদূরে চুপ করে বসে থাকতো নিষ্কম্প, নিঃশব্দ, রাত্রির নিস্তব্ধ আত্মার মতো, পৃথিবীর বিস্মৃতি দিয়ে তৈরি, কবির ধ্যানে মৃত্যুর অকায়িক কল্পনার মতো। স্পর্শের অতীত যেন কোনো স্পর্শ, স্বাদের অতীত যেন কোনো স্বাদ। কতো ভালো লাগতো তাকে সেই বিধুর অস্পষ্টতার মধ্যে, সেই অতীন্দ্রিয়তাই ছিলো তার আপন নির্মিতি, দীর্ঘায়মান একটি গোধূলির ঔদাস্য। তাকে সে সব দিন কত আত্মীয় মনে হতো তার সেই বেদনার লাবণ্যে, তার সেই পরিব্যাপ্ত নির্জনতায়। আজ সুখি সাজতে গিয়ে সে কতো দরিদ্র হয়ে পড়েছে, সার্থক হতে গিয়ে কত বঞ্চিত। শূন্যপথে স্খলিত তারার মতো চকিত দীপ্তি ছড়িয়ে সে নেমে যাচ্ছে কোন অন্ধকারে। তার চেয়ে পৃথিবীর বাতায়নের বাইরে তার দূর দুর্নিরীক্ষ্য আভাটুকু কত ভালো ছিলো। কত ভালো ছিলো তার অন্তর্লীন নির্লিপ্ততা। তার চারপাশে সেই ধূসর পরিমণ্ডল। কিন্তু পৃথিবীতে সুখই সবাই চায়, সৌন্দর্য কেউ নয়—সৌন্দর্য এখানে একটা অবান্তর উপসর্গ।

ভাবতে-ভাবতে সৌরাংশু চিন্তার কোন অননুভূয় গভীরতায় গিয়েছিলো ডুবে, হঠাৎ প্রবল হাওয়ায় ঘরের দরজা দুটো খুলে গেলো। বাইরে থেকে জোয়ারের জলের মতো শব্দ করে ঢুকলো কতোগুলি অন্ধকার, যেন বা ঝড়ে কোথায় বন উঠেছে মর্মরিত হয়ে। চমক

ভেঙে সৌরাংশু যাচ্ছিলো দরজা বন্ধ করতে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঝলসে উঠলো আলো, তীক্ষ্ণ দীর্যমান একটা আর্তনাদের মতো।

আলোয় তাকাতে গিয়ে সৌরাংশু ঘরের দেয়ালের মতো সাদা, স্তম্ভিত হয়ে গেলো। দেখলো ঘরের সেই অজস্র আলোয় ললিতা এসে দাঁড়িয়েছে। আলো-কে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে তার সাহস হলো না। ললিতা এসে দাঁড়িয়েছে, তার বিকেলের সেই সাজে, স্খলিত তারার মত, নির্ভুল, তীক্ষ্ণ—কোথাও নেই জড়িমা, কোথাও নেই কুজ্ঝটিকা। রৌদ্রফলিত অসির প্রান্তের মত শাণিত, দৈর্ঘে ও দৃপ্তিতে গয়নাগুলি আলোয় উঠেছে বিলোল অট্টহাস্য করে। সৌরাংশু একবার চোখ বুজে আবার চেয়ে দেখলো। ললিতা। নিষ্ঠুর নির্ভীকতায় স্থির, রূঢ়, প্রত্যক্ষ। কিম্বা হয়তো বা ললিতা নয়, তার একটা প্রেতায়িত বিভীষিকা, রাত্রির শীতল, মৃত অন্ধকার থেকে উঠে এসেছে।

—এ কী, আপনি? বহু কষ্টে অনেকক্ষণ পর সৌরাংশু তার গলায় ভাষা পেলো।

—হ্যাঁ, আমি। একতাল পাথর যেন কথা কয়ে উঠলো: কেন, চিনতে পাচ্ছেন না?

—কী করে বা চিনবো? চেয়ারটা ছেড়ে সৌরাংশুর ওঠবার পর্যন্ত শক্তি নেই: এত সাজলে লোকে কী করে চিনতে পারে?

—খুব সেজেছি নাকি? ললিতা করুণ, শুকনো চোখে নিজেই নিজের দিকে একবার তাকালো।

সৌরাংশু তার মুখের উপর সবলে যেন একটা আঘাত করলো: ভীষণ কুৎসিত। সৌভাগ্য একটা বর্বরতা, যদি তা জানাবার জন্যে মানুষকে এমন বীভৎস সাজতে হয়, যদি হারাতে হয় তার পরিমিত ছন্দবোধ।

ললিতা অস্ফুট একটি শব্দ করে হেসে উঠলো যা শোনালো একটা নিরুচ্চার, গভীর কান্নার মত। বললে,—ঘটা করে সৌভাগ্য

জানাবার জন্যে আমি সাজি নি, সেজেছি আজ আমি মরবো বলে।

বিবর্ণ মুখে সৌরাংশু একটা কাতর শব্দ করে উঠলো।

—হ্যাঁ, মরবো বলে। ভয় নেই, তেমন কোনো বিশদ, বাস্তব মরণ নয়। ললিতা আবার নিম্নকণ্ঠে হেসে উঠলো: প্রতি মুহূর্তেই তো আমরা মরছি, দিন থেকে রাত্রিতে, প্রতিটি নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে। তেমনি আজ আমি মরবো, আমার বিশাল সেই অতীতের স্তূপ থেকে নতুনতরো ভবিষ্যতে, নতুনতরো মুক্তিতে। ললিতা যেন কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো, মন্থর এক পা এগিয়ে এসে বললে,—আমাকে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, সৌরাংশুবাবু?

—না। ঘরের দেয়াল আবার কথা কইলে।

ললিতা দেয়ালে-টাঙানো অনড় একটা ফটোর ফ্রেমএর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

সৌরাংশু উঠলো আপাদমস্তক ছটফট করে। চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু গলায় হঠাৎ জিগগেস করলে: আমার কাছে আপনার কোনো দরকার আছে?

—আছে বৈ কি। নইলে এখানে আর আসবো কেন বলুন? ললিতা সৌরাংশুর কথার নাগাল পেয়ে যেন সহজে নিশ্বাস ছাড়তে পারলো, বেদনায় অস্ফুট গলায় বললে,—অনেক, অনেক দরকার। আস্তে সে দরজা দুটো ঠেলে ভেজিয়ে দিলো, বসলো এসে একটা চেয়ারে, বিস্তৃত, শিথিল আলস্যে: জরুরি দরকার বলেই তো আপনার কাছে এসেছি। ললিতা যেন তার উপস্থিতির বহু দূর থেকে কথা কইলো।

—কিন্তু, সৌরাংশুর গলা শোনা গেলো রূঢ় একটা তিরস্কারের মতো: কিন্তু এখন, এই রাতে, আমাকে আপনার কী দরকার থাকতে পারে আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

—রাতকে মিছিমিছি এতো ভয় পাবার কী হয়েছে? সে নিতান্ত

অন্ধকার বলে তাকে কেন এতো লজ্জা? আমাদের জীবনেরই তো সে ও-পিঠ, আমাদের রঙ্গমঞ্চের নিকট নেপথ্য। বলছি, দাঁড়ান। ললিতা আলোয় যেন আশ্রয় খুঁজলো; স্তিমিত, কাতর গলায় বললে,—কিন্তু কী বলে যে কী বলবো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—বলে ফেলুন চট করে। সৌরাংশু বসলো গিয়ে তার চেয়ারে, ভঙ্গিটা যথাসম্ভব সৌজন্যে স্নিগ্ধ করে আনলো: আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম, ঘুম আমারো পাচ্ছে বৈ কি। চেয়ারে পিঠটা নামিয়ে এনে ললিতা গভীরতরো আলস্যে গেলো ডুবে।

ঘনীভূত হয়ে উঠলো রাত্রির স্তব্ধতা, গূঢ়, নিরবয়ব ভয়। সেই স্তব্ধতায় ললিতাকে মনে হলো যেন পর্বতের গুহার মধ্যে হিংস্র কোন পশু রুদ্ধ প্রতীক্ষায় বসে আছে। এত প্রখর সাজসজ্জায় তাকে দেখাচ্ছে আগুনের মত ভয়ঙ্কর, তার খোলা চুলে যেন কালো মেঘের একটা ঝড় উঠেছে। দুই চোখ মেলে সৌরাংশু আর তাকাতে পারলো না, সহ্য হচ্ছে না তার এত আলো, এত আলোকিত নীরবতা। যেন সেই স্তব্ধতার মর্মমূল থেকে ধীরে একটা নিশ্বাস উঠলো, ললিতার করুণ কান্নার মতো। সৌরাংশু উঠলো চম্‌কে, এতোটা সে আশা করে নি। ললিতাকে দেখাচ্ছে যেন এখন জ্যোৎস্নারাতে নির্জন একটা সমাধির মত, এত আড়ম্বরের মাঝে এত রিক্ততা যেন কল্পনা করা যায় না। খানিক আগে তার যে একটা দ্যুতিমান, দুঃসহ তীক্ষ্নতা ছিলো, এখন একটি মাত্র আর্দ্র দীর্ঘশ্বাসে যেন তা মুছে গেলো জলের আলপনার মতো। যেন আঙুরের লতা নিকটতম কোনো সূর্যের জন্যে আঙুল বাড়িয়েছিলো, নাগাল না পেয়ে শেষকালে মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে।

সৌরাংশু অস্থির হয়ে বললে,—কী আশ্চর্য, কী দরকার ছিলো বলুন।

ললিতা অলস, দীর্ঘ একটি দৃষ্টিরেখায় সৌরাংশুর মর্মান্তমূল পর্যন্ত

স্পর্শ করলো ; গাঢ়, শান্ত গলায় বললে,—আপনার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে।

সৌরাংশু উদাসীনের মত বললে,—কী ?

ললিতা বললে,—দয়া করে আমাকে আজ এখান থেকে নিয়ে যাবেন ?

সৌরাংশু ম্লান হয়ে গেলো : কোথায় ?

—জানি না, জানি না কোথায়। ললিতা হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকলো, যেন মুছে দিতে চাইলো এই উদ্‌ঘাটনের লজ্জা, রুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—শুধু জানি আমি যাবো, এখানে আমি আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না।

সৌরাংশু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো : আপনি এ কী বলছেন পাগলের মতো ? আমি কোথায় নিয়ে যাবো আপনাকে ?

ললিতা মুখ তুললে, শিশিরে প্রস্ফুটিত বিলোল ফুলের মতো : এ ঘরের বাইরে, এ পরিচয়েব বাইরে, আর কোনো নতুন আকাশের নিচে। সৌরাংশুর বিস্মিত, বিমূঢ় মুখের উপর ললিতা যেন আরেক মুঠো ছাই ছুঁড়ে মারলো : একদিন আমাকে গায়ে পড়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন না, আজ আমি আপনার কাছ থেকে সেই করুণাটুকুই ফিরে চাইছি, এর বেশি আর কিছু নয়।

সৌরাংশু মৃত দেয়ালের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, দেয়ালে লেখা যেন কোনো মৃত কথা সে উচ্চারণ করলে : কিন্তু সেদিন যার কাছে আপনাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম তিনি তো কাল সশরীরেই ফিরে আসছেন।

—আসুন, ললিতা হঠাৎ কান্নার একটা ঠাণ্ডা ঝাপটা হানলো : ততোক্ষণ, তার আগে আমি মরে যেতে চাই, আমার সেই অতীতের অত্যাচার থেকে। দেখছেন না আমি কেমন সেজেছি। ললিতা আবার কুটিল ঠোঁটে হেসে উঠলো : কেউ আসবে বলে নয়, আমিই যাবো বলে।

—কিন্তু আপনি কেন যাবেন ? এ তো মহা মুস্কিলের কথা দেখতে পাচ্ছি। সৌরাংশু যেন তখনো পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে না : কাল সকালে মহীপতিবাবুই তো আসছেন।

ললিতার মুখ আবার গম্ভীর হয়ে গেলো : তার জন্যে আমরা বসে থাকতে পারি না, সৌরবাবু। ললিতা তার গা থেকে বিশ্রান্ত ভঙ্গিটা সবলে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো : চলুন, আর দেরি নয়, আমরা বেড়িয়ে পড়ি।

এতো আলোয় সৌরাংশু যেন চারদিকে অন্ধকার দেখলে। সে ঠিক নিশ্বাস নিচ্ছে কিনা সেই মুহূর্তে তা বোঝা গেল না। খানিকক্ষণ পাথরের মতো সে স্তূপীভূত হয়ে রইলো, অস্পষ্ট, অর্দ্ধচেতন গলায় বললে,—কিন্তু আমি, আমি যাবো কেন ?

—হ্যাঁ, আপনিও যাবেন বৈ কি। আপনার এখানে আর কী কাজ ! ললিতার স্বর জমানো বরফের মতো কঠিন : আপনি তো একদিন যাবার জন্যেই চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন, আমিই তো অপনাকে সেদিন ধরে রেখেছিলাম। ধরে রেখেছিলাম, কখন আমাদের জীবনে এই যাবার লগ্ন এসে পৌঁছুবে। কেনই বা আপনি যাবেন না ? ললিতার কথাগুলি বাণের মত বিকীর্ণ হতে লাগলো : আপনার আর কাজ কী এখানে ? নটুর অসুখের জন্যেই তো দয়া করে আর কটা দিন আপনি ছিলেন, সেই নটু তো ভালো হয়ে উঠলো। আর আপনি তবে বসে থাকবেন কেন ? বাকি এই রাতটুকুও এই বাড়ির ছাদের নিচে কাটাবার আপনার কথা নয়।

—তা হয়তো আমি যাবো, প্রতি শব্দে সৌরাংশু হোঁচট খেতে লাগলো : কিন্তু, অসম্ভব, আপনি কি বলেছেন আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, আপনাকে নিয়ে আমি যাবো কোথায় ?

—না-হয় আমিই আপনাকে নিয়ে যাবো। ললিতা কান্নার চেয়েও করুণ করে হেসে উঠলো : কোথায় যাবেন সে-কথা বাইরে গিয়ে

বিচার করা যাবে। কিছুই আপনার ভয় নেই, আমার কাছ থেকে কিছুই আপনার ভয় নেই, সৌরবাবু, পুরুষের আবার ভয় কী!

মুহূর্তে সৌরাংশুর মেরুদণ্ড উদ্ধত হয়ে দাঁড়ালো; সবল, দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে,—আপনি লোক ভুল চিনেছেন, ললিতা দেবী!

—মোটেই ভুল চিনি নি। আমি দেখেছি, দেখেছি আপনার অন্তরের নির্মলতা, ললিতার অনিমেষ দুই চোখ বেয়ে জলের দীর্ঘ, বিচ্ছিন্ন দুটি ধারা নেমে এলো গালের উপর: আপনার নিষ্ঠুর মহত্ব। কিন্তু আপনার কাছে সামান্য এইটুকু বন্ধুতার অতিরিক্ত আর কিছু আমি চাই তা মনে করবেন না, আপনার মাঝে চাই শুধু একজন পুরুষের সবল সাহচর্য। এর বেশি কোনো অশোভন দাবি আমার নেই। আপনাকে চিনি না? ললিতার চোখে বুঝি জল দাঁড়িয়ে গেলো: আপনার পাষাণকায় পবিত্রতাই তো আমার একমাত্র নির্ভর। আপনি নির্মলতায় এতো নিষ্ঠুর বলেই তো আমি আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি। চলুন, আমি পারছি না আর থেমে থাকতে। ললিতা যেন মেঝের উপর এখুনি ভেঙে পড়বে।

তবুও সৌরাংশুর মুখে কোনো কথা নেই। সে যেন কোন স্বপ্নে-দেখা অস্পষ্ট মানুষ, মেঘলোকের। সমস্ত শরীরে সে ঘুমন্ত, তার ইচ্ছাশক্তিতে, তার বলীয়ান পৌরুষে। সে নয়, যেন তার একটা কঠিন কঙ্কাল আছে দাঁড়িয়ে, নীরক্ত, নিশ্চল কতোগুলি হাড়, হাড়ের মত সাদা, হাড়ের মতো শুকনো।

ললিতা হঠাৎ অনুনয়ে ভেঙে গিয়ে ফের চেয়ারের উপর বসে পড়লো; বললে, —ঈশ্বর দেখতে পাচ্ছেন এ কতোখানি লজ্জা এমনি করে অযাচিত, অসহায় এসে ভিক্ষা চাওয়া, প্রায় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো। -আপনার ভয় নেই, আপনার কাছে আমি প্রেম বলে কিছু চাই না, ললিতা বিশীর্ণ একটু হাসলো: বা সেই নামের কোনো মহিমা। চাই শুধু উজ্জ্বল একটা দুর্নাম, আশ্রয় চাই না, চাই

শুধু বিস্তীর্ণ একটা মুক্তি। এর বেশি আর কিছু নয়, নয় কোনো অন্যায় বা উদ্ধত অভিলাষ। শুধু এইটুকু করুণা, এইটুকু বন্ধুতা। আমাকে নিয়ে চলুন, সৌরবাবু। শুধু দরজার বাইরে, বাইরে শুধু আমাকে একবার পৌঁছে দিয়ে আসুন। আমাকে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন আমাকে আমার নিজের পরিচয়ে।

সৌরাংশু দূরে সরে সরে গিয়ে উদাসীন, নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—তবে আপনি একলাই চলে যান, আপনি তো একলাই চলে যেতে পারেন, আমাকে কেন ডাকছেন মিছিমিছি? আপনার সেই একলা বাঁচার মধ্যে আমার জায়গা কোথায়?

বিশীর্ণ ভঙ্গুর কটি রেখায় ললিতা উঠে দাঁড়ালো। বিষাদে সিক্ত, শীতল সেই মূর্তি এখন যেন পূজার প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। মিনতিতে ম্লান মুখে সে বললে,—সে আমার শুধু একটা পলায়নই হয়, সৌরবাবু, মুক্তি নয়। আমি পালাতে চাই না, আমি চাই বাঁচতে। আপনার কিসের ভয়, আমার কোনো ভার আপনাকে নিতে হবে না, এই রাত্রির বাইরে আমাকে না হয় আপনি ফেলে দেবেন, তবু পৃথিবীকে আমি একবার জানাবো, কান্না লুকোতে ললিতা দুই হাতে আবার মুখ ঢাকলো: জানাবো যে আমারো কাউকে ভালোবাসার অধিকার ছিলো, ইচ্ছা করলে আমিও তার সঙ্গে অনায়াসে বৃহত্তরো জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে পারতাম।

কী বলবে সৌরাংশু কিছু ভেবে পেলো না।

ললিতা আবার বললে,—পৃথিবীকে আমি সে-কথা জানাতে চাই, যে আমিও এসেছিলাম বাঁচতে, আমারো ছিলো সম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার দায়িত্ব। আমি এমনি কারু পায়ের তলায় পথের খানিকটা ধুলো হতে আসি নি। চলুন আমাকে দিন একবার সেই বাঁচবার সুযোগ আর আমার কিছু দাবি নেই, প্রার্থনা নেই। আমারো জন্যে পৃথিবীতে আছে এখনো অনেক জায়গা, হয়তো এখনো অনেক সহানুভূতি।

—সুযোগ কেউ কোনোদিন জোর করে তৈরি করতে পারে না, ললিতা দেবী, এলে তা আপনা থেকেই আসে। সৌরাংশু ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, প্রখর হয়ে দাঁড়ালো : জায়গা যদি খুঁজতে হয় তো তা একদিন আপনার নিজের মধ্যেই খুজে পাবেন। তার জন্যে পরের কাছে এসে কৃত্রিম ভিক্ষা চাইতে হবে না। যা সত্য তা দাঁড়াবে নিজের পায়ে ভর করে, যা সত্য নয়, শত ছলনা দিয়েও তাকে আপনি সত্য করে তুলতে পারবেন না, আপনার হার হবে।

ললিতা যেন তার সমস্ত শরীর থেকে মুছে গেলো।

শাড়িতে-গয়নায় তাকে তখন দেখাচ্ছে যেন শুভ্রায়িত একটা কবর। সমস্ত সজ্জা যেন শৃঙ্খলের মতো ভার হয়ে উঠেছে। ললিতার মনে হলো, এত ব্যর্থ, এত কুৎসিত, এত মুর্খ, কোনো মেয়েকে যেন কোনোদিন দেখায় নি।

সৌরাংশু তাকে নির্জলা তিরস্কার করে উঠলো : এখানে আর বসে আছেন কী করতে? ঘরে যান, আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি এবার দরজা বন্ধ করবো।

ললিতা তবু এক পা নড়লো না।

সৌরাংশু দৃঢ়তায় ফের উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : যান, আমাকে একলা থাকতে দিন। এখানে কেউ আপনাকে দেখে ফেললে—

—তাই হয়তো আমি চেয়েছিলাম আপনার কাছে সৌরাংশুবাবু, তার বেশি কিছু নয়, ললিতা মৃতের মুখের অন্তিম আভার মতো বিবর্ণ হেসে উঠলো : যাতে সংসারে একটা কীর্তি অর্জন করে যেতে পারি—আমার এই কলঙ্ক, আমার এই কাব্যসৃষ্টি দিয়ে। যাতে সমস্ত সংসারে আমি অস্পৃশ্য হয়ে যেতে পারি, একেবারে একলা, একেবারে আলাদা। সে-সুযোগ সত্যি আর আমার এলো না, স্বয়ং ঈশ্বর পর্যন্ত রইলেন চোখ বুজে। ললিতার চোখ আবার অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠলো : আমি তবে মরতেই চললাম,—কিন্তু আপনি, আপনি কেন আর তবে এখানে বসে আছেন, কিসের প্রত্যাশায়? ললিতা

আলোর থেকে ধীরে-ধীরে চলে গেলো অন্ধকারে, তার আত্মার বিলুপ্তিতে।

আর তক্ষুনি. ললিতা অন্তর্হিত হয়ে যেতেই, সৌরাংশু ক্ষিপ্র হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঘরের স্তব্ধতায় বাইরের অন্ধকার উঠলো হাহাকার করে।

তবু, ললিতার এখানকার বেদনাবিদ্ধ, ধূসর মুখচ্ছায়ার কথা ভেবে সৌরাংশু গভীর সান্ত্বনা পেলো। সে সুখি না হোক, সে আবার সুন্দর হয়ে উঠবে। দুঃখে পাবে সে আবার পরম সম্পূর্ণতা।

সৌরাংশু জানলার বাইরে রাত্রির দিকে একেবারে চেয়ে দেখলো। হ্যা, সত্যি. সে-ও তবে এখানে আর কেন বসে আছে? এই শূন্যতায় এই অন্ধকারে!

॥ আঠারো ॥

ভালো করে ভোর না-হতেই, চাপা, অনড় একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে, সৌরাংশু রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। চারপাশে সে যেন এখন অনেক জায়গা খুজে পেয়েছে, অনেক নিশ্চিন্ততা। তার চোখের আলোয় আকাশকে এখন অনেক বড়ো মনে হচ্ছে। ভোরবেলাটিতে অনেক পরিচ্ছন্ন।

কোথায় সে যাচ্ছে তা আর তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু যতই সে যাচ্ছে, ললিতার দৃষ্টির সেই দীর্ঘ কাকুতি শীর্ণ ও শাণিত একটা সাপের মত তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। তাকে সে সেই আকাশহীন দেয়ালের দেশে নির্বাসন দিয়ে এসেছে, দেয়ালের সেই শোকাকুল স্তব্ধতা বারে-বারে বেজে উঠছে তার হৃৎপিণ্ডে।

কিন্তু সেই জন্যে পথ ছোট করে আনলে চলবে না। সৌরাংশু বাস নিলে। আগে তাকে বাঁচতে হবে, পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নয়; বাঁচবার এই প্রখর, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতাতেই মানুষের মহত্ব। তাকে বাঁচতে হবে, তার নিজের অনুপাতে, নিজের পরিমাপে: কোনো কিছুর করার চেয়ে নিজের এই হয়ে ওঠার দাবিই প্রচণ্ডতরো। জোর করে কিছু করা যায় না, নিজের উপলব্ধিতে সহজেই নিজের হয়ে ওঠা চাই। যা সহজ তা-ই সত্য, সেই সহজ পথই বা সৌরাংশু ছাড়বে কেন? দেয়ালে ললিতা শত মাথা কুঠলেও সৌরাংশুর আকাশ আর ভেঙে পড়বে না।

তবু ললিতার সেই দীর্ঘ দৃষ্টির শিথিল, ভ্রান্ত রেখাটি বহুলীকৃত জনতার মধ্যে থেকে সৌরাংশুকে খুজে বেড়াতে লাগলো। ভুল, ভুল—সৌরাংশুর মেরুদণ্ডটা তার প্রেতায়িত দৃষ্টির ছোঁয়া লেগে সিরসিরিয়ে উঠলো, ললিতা ভুল লোক বেচেছে। ললিতার আর সমস্ত মনোভাবকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, কিন্তু এই নির্বাচনকে

নয়। ললিতার চোখের দৃষ্টি যেন ব্যথায় ঘনিয়ে উঠলো : জলে সে ডুবেছে, সামান্য কুটোটাকেও সে ছাড়ে না। সৌরাংশু হাসলো, সামান্য কুটোটাকেও স্রোতের নিয়ম মেনে চলতে হয়, এবং সেইখেনে তারো আছে চলবার অধিকার। সেই বিষন্ন দৃষ্টি হঠাৎ যেন ধিক্কারে উঠলো ধারালো হয়ে : কাপুরুষ কোথাকার! তবে তুমি তোমার চরিত্রের এই বলিষ্ঠ নির্লিপ্ততা দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিলে কেন? কেন তবে সেই বিশাল অন্ধকারে নটুর রোগশয্যার প্রান্তে বসে তোমার উপস্থিতির উত্তাল স্তব্ধতায় আমাকে চুপিচুপি ডাক দিয়েছিলে? কেন তোমার সঙ্গে আমার সেই পরিচয় আবর্ত্তমান প্রাত্যহিকতার তরলতায় সাবলীল, সহজ করে তোলো নি? কেন তার মাঝে রেখেছিলে ব্যবধানের অলৌকিকতা? সৌরাংশু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সদ্য-ঘুম-থেকে-ওঠা কলকাতার শোভা দেখছে : তুমি আমার জীবনে সেই নারী যে মনে মোহ না এনে আনে বিস্ময়, পুরুষের কামনার সেই ধ্যানমূর্তি। তোমাকে তাই আমি প্রতিদিনের নিরন্তরাল প্রবাহে এনে আবিল করে তুলি নি, তোমাকে রেখে দিলাম সেই চিরকালের মৌনতায়। কথা, আর কথা, ললিতার সেই ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি সৌরাংশুকে যেন লেহন করতে লাগলো, সেই নির্বাক দৃষ্টির কাছে কোনো কথাই পেলো না উচ্চারণ, দৃষ্টির সেই মরুভূমিতে কোনো কথাই পারলো না সান্ত্বনার ছায়া সঞ্চার করতে।

কোথায় তাকে বাস থেকে নামতে হবে তা-ও সৌরাংশুর মুখস্ত। তার পৌরুষ নিয়ে সে গর্ব করতে না পারুক, তার প্রেম আছে অবিচল। ঐ তো সুমনাদের মেয়ে-মেসটার দরজা দেখা যাচ্ছে। ঠিক এখন হয়তো দেখা করবার সময় নয় তবু সেই রাত্রির পরে, এই নতুন ভোরবেলায়, আর কার কথা তার সবাইর আগে মনে পড়তে পারে, এই নতুন নির্মলতার সঙ্গে আর কার আছে এত মিল?

সৌরাংশু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ললিতার সেই লেলিহান, দীর্ঘ দৃষ্টি এখনো তার পথ ছাড়ছে না।

দরোয়ানের হাতে শ্লেটে নাম লিখে পাঠিয়ে সৌরাংশু বাইরের ঘরে এসে বসলো। জানতো, এ সময়টায় সুমনা মাষ্টারি করতে বেরোয়; ভেবেছিলো, বাইরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু দারোয়ানের কাছ থেকে জানা গেলো, সকালবেলার মাষ্টারিটা তার আর নেই, অতএব শ্লেট পাঠাতে হবে।

অন্তরালে সিঁড়িতে চটি-জুতোর শব্দ শোনা গেলো, সৌরাংশুর বুকের রক্ত দুলে উঠলো সেই শব্দে। ভিতরের দরজার পরদা ঠেলে সুমনা বেরিয়ে এলো—হাসিমুখে, ঝড়ে-ওড়ানো লঘু এক-টুকরো মেঘের মতো। বললে,—কী আশ্চর্য আমিই যে তোমার কাছে যাবো ভাবছিলাম।

সৌরাংশু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এক মুহূর্ত সুমনার দিকে তাকিয়ে রইলো। সত্যিই এ সুমনা কিনা চিনতে যেন তার দেরি হচ্ছে। সুমনার এমন বেশবাস, বেশবাসে এমন প্রজাপতির চপলতা সে কোনোদিন লক্ষ্য করে নি। পরনে ফিনফিনে পাৎলা একটা শাড়ি তার সারা গায়ে যেন স্ফুর্ত্তির ঢেউ এনেছে, কাঁধের উপর দিয়ে আঁচলটা লতিয়ে নেবার অলস ভঙ্গিতে সে যেন আজ অনেকটা প্রগলভ, কানে রূপোর ছু'টো ঝুম্‌কো, পায়ে জরির ষ্ট্র্যাপ-দেয়া পাৎলা স্যাণ্ডেল ঘাড়ের উপর খোঁপাটা তার ভাঙছে না—সুমনা যেন উড়ছে। তার সমস্ত দাঁড়িয়ে-থাকাটি যেন আনন্দের একটা শিখা, সমস্ত মুখ বিশাল ফুলের মতো কাঁপছে যেন তার উন্মোচনের ঔজ্জ্বল্যে। সুমনাকে কোনোদিন এমন স্পষ্ট দেখায় নি—এতো উচ্চারিত, এতো উদ্দাম: বেশবাসে, তার সঙ্ক্ষিপ্ত, সম্বৃত বেশবাসে তাকে চিরকাল কেমন উদাস দেখাতো; কেমন অনুপস্থিত। সে যে সুন্দর তার শক্তিমত্তায়, সে-কথা সে ভুলেই ছিলো এতদিন। আজ যেন সারা শরীরে হঠাৎ তার ছুটি মিলছে।

তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুমনা বললে,—সকালে তুমি কি মনে করে? বোসো।

সৌরাংশু চেয়ারে বসে বললে,—তোমার কাছে আসতে হলে কিছু মনে করে আসতে হয় নাকি ?

সুমনা হাসলো, বললে,—ভাগ্যিস তবু এসেছিলে। আমার উইল-ফোর্স আছে বলতে হবে। সারা রাত কেবল ·তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সৌরাংশুও হাসলো ঃ তারপর সেই আনন্দে বুঝি খানিকটা সাজগোজ করলে ?

—বা, আমি যে এখন বেরুবো।

—বেরুবে মানে ? সকালবেলা মাষ্টারি তো আর করো না শুনলাম।

—তাই তো এতো সাজ, মুক্তির নীলিমা। সুমনার চোখ আবেশে পিছল হয়ে উঠলো ঃ সবাইর আগে তোমার কাছেই তো এখন যাচ্ছিলাম, সবাইর আগে তোমাকে খবর দিতে।

সৌরাংশু কী বুঝলে তা সে নিজেই জানে, আনন্দের আকস্মিক অন্ধতায় সুমনার সে হাত চেপে ধরলো। তাকে অনুভব করলো যেন তার আত্মার তাপমণ্ডলে। যতো কথা ছিলো, হারিয়ে গেল সব তার শরীরের স্তব্ধতায়।

স্খলিত একটি মুহূর্ত। সুমনা আস্তে-আস্তে ফের সরে আসতে-আসতে বললে,—হ্যাঁ, তোমাকে খবর দিতে, এই আসচে পনেরোই মার্চ আমি বিলেত যাচ্ছি।

—বিলেত যাচ্ছ ? সে কী ! সৌরাংশু যেন এক নিশ্বাসে শুকিয়ে গেলো।

—হ্যাঁ, লণ্ডন। প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে পর্যন্ত। মাঝে কটা দিন আর আছে বলো ? সুমনা ম্লান একটু হাসলো ঃ এখনো কতো কাজ।

—কই, আমি তো কিছু জানতে পাইনি।

—সব একেবারে ঠিকঠাক করেই জানাবো ভেবেছিলাম। কিছুই তৈরি ছিলো না, আমিও জানতাম না কিছু ঘুণাক্ষরে, সুমনার গলা

উৎসাহে ঈষৎ ধারালো হয়ে উঠলো : হঠাৎ ঠিক হয়ে গেলো ; সমুদ্র আমাকে ডাক দিলে।

—কিন্তু এমন তো কোনো কথা ছিলো না, সৌরাংশু শুকনো মুখে বললে—ওখানে, বিলেতে তোমার কী ?

—আমার ভবিষ্যৎ। বিস্ফারিত আঁচলে সুমনা সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো : আমি আরো কিছু হবো আরো কিছু করবো—এমনি একটা স্বপ্নের মহাদেশ। তুমি জানো আমি কদিন থেকে স্বপ্নে কেবল সমুদ্রের ঢেউ দেখছি। উঃ, আমি যাবো, সে কী রোমাঞ্চ, মাঝের এই দিনগুলোই শুধু যাচ্ছে না।

—সেখানে গিয়ে তুমি কী করবে ?

—কিছু একটা করবো নিশ্চয়ই, মেয়েদের পক্ষে যা সাধ্যতমো। সুমনা হাসলো : কিছু নেহাৎ না করতে পারি, বেড়াবো, লোক দেখে, দেশ দেখে, আকাশ দেখে,—বিস্তারিত করে দেবো আমার অস্তিত্ব, আমার সময়ের পরিধি।

সৌরাংশু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো তার মুখের দিকে। বললে,—এতো তোমার পয়সা হলো কবে ?

—পয়সা, পয়সার জন্যে আর ভাবি না। পয়সা শেষ পর্যন্ত হয়ে যায়।

—বাড়ির মত পেয়েছ ?

সুমনার হাসিতে এলো এবার লজ্জার কুহেলিকা। কানের ঝুমকোটা আঙুল দিয়ে অনুভব করতে-করতে ঈষৎ অন্যমনস্কের মতো বললে—স্বচ্ছন্দে। বাড়ির মত না পেলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা আমি বাইরে যেতে পারি কখনো ? বাড়ির মত পেয়েছি বলেই তো—

—বলো কী ? অথচ তোমার ওপরেই তোমার সমস্ত পরিবার নির্ভর করে আছে। তুমি চলে গেলে তাদের চলবে কী করে ? সেটা কিছু ভেবে দেখেছো ?

—তারো একটা ব্যবস্থা হয়েছে বৈ কি। চলো, সুমনা নির্ভুল

এক পা এগিয়ে এলো : একটা ট্যাক্সি নি। খানিকক্ষণ খুব বড়ানো যাক। অনেক কথা আছে।

—না, তুমি বলো কী কথা। সৌরাংশু অন্ধকারে যেন ভূত দেখছে এমনি পাথুরে গলায় অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলো।

সুমনার চোখের পাতার মৃদুতম পালকটিও একটু কাঁপলো না। ঠোঁটের কিনারে হাসিটি তেমনি জ্বালিয়ে রেখে নির্জল গলায় বললে,—তোমায় বলছি, তোমায় না বললে কাকে আর বলতাম—এই আসচে রবিবারে আমার বিয়ে হচ্ছে।

—বিয়ে হচ্ছে ? সৌরাংশুর হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের থেকে মাটির উপর খসে পড়লো।

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে ?

—আছে সে একজনা। ব্যক্তি হিসেবে না হলেও বিত্তহিসেবে নামজাদা। তার সঙ্গেই আমি বিলেত যাচ্ছি।

—তার সঙ্গেই তুমি বিলেত যাচ্ছ ?

কথার সুর শুনে সুমনা চমকে উঠলো। ব্যস্ত হয়ে বললে—না, তুমি চলো বাইরে। সব কথা তোমাকে খুলে বলতে হবে। নইলে তুমি কিছু বুঝতে পারবে না।

—দরকার নেই, সংক্ষেপে বললেই আমি বুঝতে পারবো সমস্ত। সৌরাংশু চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসলো : কোনো মাড়োয়ারি নাকি, না কোনো শিখ মোটর-ড্রাইভার ?

সুমনা গম্ভীর হয়ে বললে,—না, অতোদূর যেতে হয় নি। কাছাকাছিই—পূর্ববঙ্গের এক জমিদার, আমার সঙ্গে সবে মাস তিনেক আগে আলাপ হয়েছে—তাদের বরানগরের বাড়িতে আমি সকাল বেলা পড়াতে যেতাম। সেই আলাপ—

বিদ্রূপে বিষিয়ে উঠে সৌরাংশু বললে,—সেই আলাপ ফেঁপে উঠলো এই ভালোবাসায় ?

—না, ততো সময় ছিলো না, তুমি কিছু মনে কোরো না, সুমনা মুখভাব তরল করে আনবার চেষ্টা করলো: সেই আলাপে আমরা পর্বতচূড়া থেকে একেবারে সমতল মাটিতে নেমে এলাম। আমাকে বিয়ে করা যায় কি না জানবার জন্যে ভদ্রলোকে মা-কে সটান চিঠি লিখলেন। মা তো চেয়ে আছেন আমারই মুখের দিকে, আমি এবার আর মুখ ফেরালাম না। কারণ -

—কারণ, সৌরাংশু ডুবতে-ডুবতে বললে—কারণ ভদ্রলোকের টাকা আছে।

—যদি তা বলো, আপত্তি করবো না। সুমনার গলায় সামান্য একটা পরদা পর্যন্ত নেই; নিশ্চিন্ত, নিস্পৃহ গলায় বলতে লাগলো: সে যে কতো টাকা আমি কল্পনায় ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছি না। আমার সংসারের সমস্ত সমস্যা এক নিমেষে শেষ হয়ে গেলো। বিয়ের কথায় রাজি হওয়া মাত্রই ভদ্রলোক মা-কে হাজার পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, মানে, তাঁর নামে খুলে দিয়েছেন একটা ব্যাঙ্ক-য়্যাকাউন্ট। তারপর আমাকে সঙ্গে করে যাচ্ছেন ইউরোপ—আপাততো লণ্ডন, যতোদিনে হোক যদি কিছু একটা পড়ে-টড়ে পাশ করতে পারি ইচ্ছে মতো—এতোদিনে, এতোদিনে আমার ছুটি মিলেছে।

—এতোদূর? সৌরাংশু পীড়িত, নীরক্ত মুখে বললে,—এই কথা শুনে আমি কিছু মনে করবো না বলে খানিক আগে তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে?

—মনে করা তো অন্তত উচিত নয়, যদি তুমি বুদ্ধিমান হও।

—যদি আমি বুদ্ধিমান হই?

—হ্যাঁ। কেননা, শুধু বুদ্ধিমানই এ সুযোগের সুবিধে নিতে পারে। সুমনা আরেকটা চেয়ার টেনে বসলো, অনেকগুলি কথা বলতে পেরে সে-ও যেন কতকটা হালকা হতে পেরেছে: বুদ্ধিমান হলেই ভাবের চেয়ে যুক্তিকে বেশি প্রধান্য দিতে পারবে।

চেয়ারের মধ্যে সৌরাংশু ছটফট করে উঠলো : এরি জন্যে তুমি আমাকে এতোদিন প্রতীক্ষা করতে বলেছিলে ?

—কী করবো বলো, সুমনার গলা বেদনায় আবার কখন আর্দ্র হয়ে এলো : মানুষের জীবনে সুযোগ কখনো দুঃখের মতো ঝাঁক বেঁধে আসে না। তা তো তুমি জানো। নিজের অর্থে, নিজের অনুপাতে, বাঁচতেই যদি এসেছি, যদি বা বলো, নিজের প্রয়োজনে, তবে শুধু খেলার ছলে সুযোগ আমরা হারাতে পারি কী বলে? জীবনের সবটাই যদি স্বপ্ন হতো তো তাতে সুখ থাকতো বটে, কিন্তু স্বাদ থাকতো না।

সৌরাংশু চেয়ার থেকে এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠলো : এই—এই তোমার ভালোবাসা ?

সুমনা প্রশান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে আপ্লুত করে বললে,—জানি না। কিন্তু এটা যা-ই হোক্, আমাব ভালোবাসার চেয়ে আমার ভবিষ্যৎ অনেক বড়ো জিনিস।

—তোমার ভবিষ্যৎ ?

—হ্যাঁ, সুমনা একটুও নড়লো না, নির্বাষ্প, নিস্পৃহ গলায় বললে, —আমার এই বৃহত্তরো অস্তিত্বের সাধনা। আমি অনেক কিছু হবো, অনেক কিছু করবো, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বো,—আমার এই উদ্ধত স্বপ্ন। তুমি বলতে চাও, যদি সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো, সুমনা এখানেও একবার হাসলো : শুধু সেই একটা রঙিন কুহেলিকার মধ্যে থেকে আমার এই সার্থকতার সম্ভাবনাকে আমি সমূলে নষ্ট করে দেবো? আর সেইখানেই আমার ভালোবাসাটা একেবারে ধন্য হয়ে যাবে মনে করছ ?

—দয়া করে তুমি ভালোবাসার কথা কিছু বোলো না।

—না, আমি চাইওনা বলতে। আমি তার জন্যে নই, যেমন সূর্য নয় রাত্রির জন্যে। সুমনাও উঠে দাঁড়ালো : আমাকে তুমি যা-কিছু ভাবতে পারো, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, হীনতর, আর যা-কিছু তোমার

মনে হয়, কিন্তু তোমাকে একদিন ভালোবেসে ছিলাম বলেই বলছি, যাতে আমি সম্পূর্ণ না হবো, তাতে আমি বিশ্রাম পাবো না কোনো-দিন। আমি ভালোবাসার জন্যে নই, আমার নয় সেই মুহূর্তের অমরত্ব। আমার জন্যে, সুমনা সৌরাংশুর সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে এলো দরজার দিকে : আমার জন্যে বিরাট স্বার্থপরতা, আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি বাঁচবার তীব্রতায় প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ করে মরতে এসেছি।

—কিন্তু, সৌরাংশু অতি কষ্টে বলতে পারলো, পুরুষ বলেই বলতে পারলো : কিন্তু আমার কথা তুমি একবার ভেবে দেখলে না ?

—দেখেছি, ভেবে দেখেছি তোমারো একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ আছে। সুমনা সমস্ত শরীরে আবার স্পর্শহীন, উদাস হয়ে গেলো : সেই ভবিষ্যতের তুলনায় আমার এই বর্তমানটা তোমার কিছু নয়। শুধু কতোগুলো কথার বাঁধন দিয়ে তোমার সেই ভবিষ্যৎকে আমি সঙ্কীর্ণ করতে চাই না, তোমাকেও আমি ছুটি দিয়ে গেলাম।

—তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

—কেননা, আমাকে নিয়ে তুমি সুখি হতে পারতে না, মাত্র ভালোবাসায় কেউ সুখি হতে পারে না পৃথিবীতে। ভালোবাসাটাও মনের একটা আবহাওয়া, কতোদিন গুমোট করে থেকে কোনোদিন বা ঝড় উঠে যেতে পারে।

সৌরাংশুকে তবু কথা বলতে হচ্ছে : আর তোমার পূর্ববঙ্গের আকাশেই কোনোদিন ঝড় উঠবে না ভেবেছ ?

—উঠুক, কিন্তু সেটা দুঃখেরই হবে হয়তো, লজ্জার হবে না। তোমার-আমার মৃত্যুর চেয়েও লজ্জাকর হবে সেই তোমার-আমার ভালোবাসার মৃত্যু।

—শুনে কৃতার্থ হলাম। সৌরাংশু ঠাট্টায় ঝাঁজিয়ে উঠলো : কিন্তু একমাত্র টাকা দিয়েই পৃথিবীতে সুখ কিনে নিতে পারবে ভেবেছ নাকি, সুমনা ?

—আপাততো দুটো জিনিস তো পেলাম। সুমনা শব্দ করে হেসে ফেললে।

—কি?

—মা ও ছোট ভাইদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা, আর আমার এই বিলেত যাওয়া—সমুদ্রের ওপর দিয়ে। হাসির জলে ধুয়ে সুমনার গলা ঠাণ্ডা, তরল হয়ে এলো : সুখ আমি চাই না, সুখ মানেই তো থেমে যাওয়া—আমি চাই এই যাত্রার রোমাঞ্চ, এই আমার দুঃসাহসিক অভিযানের মত্ততা—এর কাছে আমার বিয়েটাও একটা সাধারণ, নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। যেমন আমাদের পার্থিব এই জন্ম মার জঠর থেকে। এই যে আমি চলতে পারছি এইখানেই পাচ্ছি আমার জীবনের স্পন্দন, আমি পৃষ্ঠা উলটে যাচ্ছি বারে-বারে। দয়া করো, আমার ওপর না করো, অন্তত নিজের ওপর দয়া করো, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, আমার সকল দুঃখের চাইতে সেই দুঃখই তা হলে বেশি হবে।

সৌরাংশু নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এলো।

—যেয়ো না, দাঁড়াও। আমিও যে বেরুবো এখুনি, তোমার সঙ্গে আরো যে আমার অনেক কথা আছে। ভালো করে কিছুই তার এখনো বলা হলো না। শোনো, আমি আসছি।

সুমনা তার পিছু নিলে। কিন্তু সে তখন গলির বাঁক প্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

॥ উনিশ ॥

ধরণীবাবু ধমকে উঠলেন : কিন্তু তবু সে একজন মানুষ, রুগ্ন, অসহায়, তোর কাছে আজ অতিথি, এসেছে তোরই আশ্রয়ের আশায়, আর কোনো বোধ না থাক, মানুষের প্রতি সামান্য একটা করুণাবোধও তোর নেই ? তুই এতোদূর নেমে গেছিস ?

ললিতা নিস্তেজ, বিশীর্ণ গলায় বললে,—কই আর নামতে পারলাম, বাবা ? নামতে পারলে তো বেঁচেই যেতাম কবে।

—এর চেয়ে নারীর আর কী অধোগতি কল্পনা করা যায় ? ধরণীবাবু রুক্ষ মুখে বললেন,—তোর স্বামী রুগ্ন, অক্ষম হয়ে তোর কাছে ফিরে এসেছে, আর তুই তার মুখের ওপর তোর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলি ? তোর এতোটুকু কোথাও বাধলো না ?

—কেউ তাকে ফিরে আসতে বলে নি, বাবা। তাকে চলেও যেতে বলেনি কেউ ঘটা করে। তার খেয়াল হয়েছিলো, চলে গিয়েছিলো একদিন ; খেয়াল হয়েছে, ফিরে এসেছে আবার। এর মধ্যে আমি কোথায় ?

—কিন্তু তোর জন্যেই সে ফিরে এসেছে জানিস ?

—আমার জন্যে ? ললিতার দুই চোখ ভুরুতে কুটিল হয়ে উঠলো : এতোদিন পরে বুঝি আমাকে তার মনে পড়লো—ধন্যবাদ তার স্মরণ-শক্তিকে। এতোদিন পরে আমার স্ত্রীত্ব বুঝি তাঁর কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছে, কিন্তু সামান্য একটা স্ত্রীরো আত্মসম্মান বলে কিছু একটা থাকতে পাবে, বাবা।

রাগে ধরণীবাবু অবশ, অসহায় বোধ করতে লাগলেন : স্বামীর কাছে নারীর আবার কিসের কী সম্মান ?

—সে-কথা তো তোমরা বলবেই। ললিতা বিবর্ণ একটু হাসলো : সে আমার স্বামী, শুধু এই একটা তথ্যের কাছে চিরকাল আমি বাঁধা পড়ে থাকবো, সেখানেই আমার সংজ্ঞা, সেখানেই আমার অস্তিত্ব! কিন্তু কেন, কেন আমাকে এই অত্যাচার সইতে হবে বলো—শুধু এই একটা নামের অত্যাচার! ললিতার গলা শুকনো একটা কান্নার মতো শোনালো : আমার চেয়ে আমার একটা নাম, আমার একটা পরিচয়, এতো প্রধান হয়ে উঠবে?

ধরণীবাবু গলা নামালেন; বললেন,—কিন্তু তার এই শারীরিক অবস্থার কাছে তোর কোনো অভিমানই টিঁকতে পারে না, ললিতা। একবার চোখ মেলে দেখেছিস তাকে? তাকে স্নেহ করতে না পারিস, সেবা করতে দোষ কী? সাধারণ মানুষ হিসেবে সে তোর কাছ থেকে এইটুকুও দাবি করতে পারে না?

—এখানেও শুধু স্বামী বলেই পারছে, বাবা, সাধারণ মানুষ হিসেবে নয়। ললিতা এক পরদাও নেমে এলো না : সাধারণ মানুষ হলে কখনও সে তোমার মেয়ের সেবা পাবার জন্যে সরাসরি এ-বাড়িতে ঢুকে পড়তো না, তুমিও উদারতায় এমন উথলে উঠতে না তার জন্যে। সাধারণ মানুষ হলে সে সোজা হাসপাতালেই চলে যেতো। আর তুমি ভাল করেই জানো তোমার মেয়ে এমন কিছু নার্সিং-এর ট্রেনিং পায় নি।

ধরণীবাবু আবার তেতে উঠলেন : মহীপতিও যেতো, কিন্তু মরবার আগে তোকে একবার দেখতে চায় বলেই সে এখানে ছুটে এসেছে। তারো কিছু আয়োজন-সমারোহের ত্রুটি হতো না, কিন্তু তোরই জন্যে, আজ শুধু তোরই জন্যে, সে সব-কিছু ফেলে দিয়ে এসেছে। মনে রাখিস, সে জগদীশবাবুর ছেলে, টাকা-পয়সা, সেবা-চিকিৎসা, কোনো কিছুই তার অভাব হতো না সংসারে, কিন্তু আজ, অন্তত আজ, তুই ছাড়া আর কিছুই তার চিন্তনীয় নয়। দেখেছিস, একবার দেখেছিস তার চেহারা? এই শরীরে কেউ ট্র্যাভেল করবার রিস্‌ক্ নেয়, নিতে

পারে? কিন্তু তবু, শুধু তোর জন্যে, তোকে একবার দেখবার জন্যে, তোর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে, সে আজ মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তার ওপর এতোটুকু মায়া দেখাতে গেলে তোর মহিমা একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে? আমি ভাবছি ললিতা, তোর এতো অহঙ্কার কেন, কোথায় তুই এতো নিষ্ঠুরতা শিখলি?

ললিতা সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারলো না, এর উত্তরে কী-বা সংসারে বলবার আছে মানুষের?

কিন্তু ওর ঠোঁটে ধারালো একটি হাসি বিদ্রূপে রেখায়িত হয়ে উঠলো; সে বললে,—আমিও ভাবছি এমন একটা কাণ্ড বিধাতার রাজ্যে কী করে ঘটতে পারলো অকারণ, আর সেই বা আজ কোথায় শিখলো এই অমানুষিক করুণা? একদিন আমারই জন্যে শুনেছিলাম সে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলো, আজো শুনছি আমারই জন্যে সে পাগলের মতো ঘরের টানে ফিরে এসেছে। কিন্তু ধরো, মাঝখানে আমি যদি না থাকতাম?

ধরণীবাবু সাত-পাঁচ কিছু ভেবে উঠতে পারলেন না: তুই, তুই আবার কোথায় যাবি এখান থেকে?

—যাই নি, কিন্তু যেতে তো পারতাম, বাবা, আমিও তো কারো জন্যে তারই মতো অনায়াসে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারতাম! ললিতার দুই চোখ অশ্রুজলে জ্বলতে লাগলো: সে কী করে জানলো আমি একটা অনড় জড়পদার্থের মতো চুপ করে এখানে বসে আছি— আর কিনা তারই প্রতীক্ষায়? কী করে জানলো বলো, এখানে এসে সে আমার দেখা পাবে, আমার কাছে ইচ্ছে করলেই ক্ষমা চাইতে পারবে, আমি তাকে সেবা করবার জন্যে দুই হাতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি! আমার এখানে এমনি চুপ করে বসে থাকবার কথা নয়, বাবা, ললিতা গম্ভীর হয়ে গেলো: তাকে স্পষ্ট বলে দাও, ললিতা এখানে নেই, ললিতা বলে কোনোকালে কোনো মেয়ে এখানে ছিল না।

—কিন্তু আর তার উপর কেন রাগ করছিস, মা? অসহায়তার শেষ সীমানায় এসে ধরণীবাবু তাঁর কণ্ঠস্বরে ভেঙে পড়লেন; ললিতাকে কাছে আকর্ষণ করে ম্লান গলায় বললেন,—সে আজ তোর কাছে অত্যাচারীর বেশে আসে নি, নিতান্ত অপরাধীর মতো এসেছে। তার আজ কিছু দাবি নেই, শুধু ভিক্ষা—এইটুকুনো তুই তার পূর্ণ করবি নে?

ললিতা নিষ্প্রাণ গলায় বললে—আমিও এমন কিছু নির্দোষিতা দিয়ে তৈরী ছিলাম না, বাবা। আমিও হয়তো ভিক্ষা করতে পারতাম, আর তা পূর্ণ না হলে পৃথিবীর মুখ বিশেষ অপ্রসন্ন হতো না।

—স্বামী বলেই যদি তার উপর তোর এতো অভিমান জমে উঠে থাকে, ললিতা, ধরণীবাবু তাকে আদর করতে করতে বললেন,—শুধু, একমাত্র মানুষ হিসেবেই তাকে তুই স্বীকার করে নে। একজন নিঃসহায়, রুগ্ন, নিরাশ্রয় মানুষ আজ তোর কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের এমন একটা অসহায়তার দিনে পরমতম শত্রুও তো তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারে না। তবু তো এ তোর স্বামী, একদিন এরই হাতে তোকে আমি সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। সে-সম্পর্কের গুরুত্ব আজ যদি তুই না-ই বুঝতে চাস, তবু মহীপতি এমনিতে আজ একজন রুগ্ন, অসমর্থ মানুষ—মানুষ হিসেবে তোর কাছ থেকে এইটুকু মনুষ্যত্ব সে দাবি করতে পারে না?

ধরণীবাবুর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ললিতা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো।

—এটা এখন কাঁদবার সময় নয়, মা। ইচ্ছে করলে তাকে এখনো বাঁচানো যেতে পারে, ইচ্ছে করলে তুই তাকে এখনো বাঁচিয়ে তুলতে পারিস। একজনের জীবন, একজনের জীবন্ত হয়ে ওঠা, আজ তোর হাতে। আর সে শুধু একজন নয়, মা, তোর স্বামী! চল, তার কাছে গিয়ে একটিবার বসবি, সে তোকে দেখবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নটু ছুটে এলো। বললে,—শিগগির এসো বাবা, মোটরে করে সাহেব-ডাক্তার এসেছে।

ধরণীবাবু ব্যস্ত পায়ে নিচে নেমে গেলেন।

হায়, মানুষের অদম্য কৌতূহল, মোটরের থেকে মহীপতিকে যখন ধরাধরি করে প্রথম নামানো হয়, তখন জানালায় দাঁড়িয়ে, বোধকরি নিজেরো অলক্ষ্যে, ললিতা তাকে দেখেছিলো। তখনো তার শরীর নিঃশব্দ হাহাকারে ছিঁড়ে পড়েছে, অসহায়ের ভারে ঘরের এক কোণে সে ছিলো বসে, স্তূপীভূত হয়ে, তাব চোখের সামনে অন্ধকার গলে-গলে কখন ভোর হয়ে গিয়েছিলো কিছু তার খেয়াল নেই; অথচ বাড়ির দরজায় মোটর এসে দাঁড়ালো, শোনা গেলো বহু কণ্ঠের মিলিত ব্যস্ততা, গলার উত্তেজিত কথাবার্তা, কখনো বা উদ্বিগ্ন কাতরোক্তি, তখন সে পাবেনি আর চুপ করে বসে থাকতে, পাবেনি একটু না-দাঁড়িয়ে জানলার ধার ঘেঁসে। সত্যি কে এলো? সত্যি কে জানি এলো। সত্যি মহীপতিই এলো কি না। কী করে সে আসতে পারলো নির্লজ্জের মতো? সন্নেসির এখন কী রকম না-জানি চেহাবা হয়েছে!

মহীপতিকে চিনতে তার আজ চোখের পলক ফেলতে হয় নি। বিছানায় শোয়া অবস্থায় তাকে চাবজন লোক বাড়ির মধ্যে খুব আস্তে-আস্তে বহন করে নিয়ে আসছে। চামড়া দিয়ে মোড়া অসংলগ্ন কতোগুলি হাড়—মূর্তিমান একটা আতঙ্ক। ললিতা ক্ষিপ্র হাতে জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলো, রাগে, অপমানে, যেন বা অসম্ভব হতাশায়। সামান্য ঐ এক আঁটি হাড়ের কিনা এতো ভার, এতো অসহনীয় উৎপীড়ন! এমন কি, মৃত্যুতেও সে তার জন্যে এতোটুকু মুক্তি পেলো না? এতোকাল বিস্মৃতি দিয়ে শাসন করে এসেছে, আজ নিয়ে এসেছে মৃত্যুর উপদ্রব? ললিতা দুই হাতে জানালাটা বন্ধ করে দিলো। পথে সে এর চেয়ে আরো অনেক দুর্দর্শ রোগ দেখেছে, অনেক ক্লিষ্টতা, অনেক মৃত্যু, কিন্তু কোনদিনই সে

ঝাঁপিয়ে পড়েনি তাদের সাহায্যে, এক তিল সহানুভূতিতে হয়নি প্রসারিত। এই আগন্তুকই বা তার কে? বিশাল জনতার সমুদ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত শুধু একটা ঢেউ। ললিতা নিষ্ঠুরতায় লেগেছিলো জ্বলতে।

নটু তখনো সামনে ছিলো দাঁড়িয়ে। দিদির দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললে,—তুমি গেলে না, দিদি?

ললিতা চমকে উঠলো: কোথায়?

—নিচে। যেখানে রুগীর ঘরে সবাই ভিড় পাকিয়েছে। নটু ব্যস্ততায় উদ্বেল হয়ে উঠলো: তোমাকে যে বার-বার করে যেতে বলে দিয়েছে।

ললিতা অন্যমনস্কের মতো বললে,—কে?

—কে আবার! যার খুব অসুখ, যে আজ এসেছে আমাদের বাড়ি, যাকে দেখতে এক্ষুনি একটা ডাক্তার এলো মোটরে। তুমি দেখনি, দেখ নি তাকে, দিদি?

—কী বলে দিয়েছে সে? ললিতা যেন নটুর মুখের উপর গর্জন করে উঠলো।

—বা রে, আমার কী দোষ! নটু মুখ কাঁচুমাচু করে বললে,—আমাকে ডেকে বললে, খোকা তোমার দিদিকে একবারটি ডেকে দিতে পারো? বলো গে তাকে আমার নাম করে,—সত্যি সে আমাকে বললে দিদি, বললে—আমি হয়তো, আমি হয়তো আর বাঁচবো না। বেশ, নটু এবার ললিতার শিথিল একটা হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো: বেশ, আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি চলো তাকে জিগগেস করে এসো, সত্যি সে তোমাকে ডেকে দিতে বলেছিলো কিনা—

হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে ললিতা ধমকে উঠলো: যা, শেষকালে তোকেও ফোঁপর দালালি করতে হবে না। যা, সাহেব-ডাক্তার এসেছে, ছাখগে সে কী বলে!

কিন্তু জানা গেলো, সাহেব-ডাক্তার ধরণীবাবুকে বিশেষ আশান্বিত করতে পারেন নি। এখন শুধু নাকি ঈশ্বরের করুণা।

আশ্চর্য, আজ ললিতাই কিনা মহীপতির ঈশ্বর। এবং এই ঈশ্বরের সন্ধানই ছিলো নাকি একদিন তার জীবনের পটভূমি রচনা করে। আশ্চর্য, তারই নাকি করুণার কোনো অন্ত নেই, তাকেই কিনা সেই অকৃপণ করুণায় আজ অবারিত হয়ে উঠতে হবে। অথচ এতদিনে, আজ ভোর হওয়ার আগেও সে মরতে পারলো না, না বা পারবে সে তার এই লাঞ্ছনার ন্যায্য প্রতিশোধ নিতে। তাকে আজ সে সবলে একরাশ ঘৃণ্য আবর্জনার মত প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত করতে পারবে না। সেদিন ছিলো বা যদি সে দস্যু, তার উদ্ধত বৈরাগ্যে, আজ সে অক্ষম, অনুনয়ে শিশুর চেয়েও দুর্বল—দু' জায়গাতেই ললিতা হেরে গেলো। সেদিন সে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি, আজো পারবে না ফিরিয়ে দিতে। বারে-বারে সেই-ই কেবল ফিরলো।

আজ মহীপতি নাকি সামান্য একজন মানুষ—আর, পৃথিবীতে মানবজাতি নামে মাত্র একটাই নাকি চিরন্তন জাতি আছে। সে তোমার কাছে আজ সেই মহান সমধর্মিতার নামে সামান্য একটু সহানুভূতি চায়, মানুষ হয়ে কী তোমার সাধ্য তুমি সেই মনুষ্যত্বে না প্রসারিত হয়ে ওঠো! সে যদি আজ রুগ্ন, ভুলে যেতে হবে তোমার রুগ্নতা : সে যদি আজ মরণোন্মুখ, ভুলে যেতে হবে তুমিও একদিন মরতে চেয়েছিলে। স্বামী হবার আগে মহীপতি কেন তার কাছে সম্পূর্ণ একটি মানুষ হয়ে ওঠে নি, একদিন ললিতার এই ছিলো অভিযোগ। বিধাতা সেদিন জেগে ছিলেন—আজ মহীপতি তার কাছে সেই অপরিচিত, সেই অব্যাহত, সম্পূর্ণ মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছে।

উপায় নেই, ললিতাকে যেতে হলো নিচে, মহীপতির ঘরে। তার শরীরের সেই অবস্থায় তাকে উপরে তুলে আনা সম্ভব ছিলো না। সৌরাংশুর বিশৃঙ্খল ঘরে, আপাততো তারই তক্তপোষের উপর, কোনো রকমে একটা বিছানা করে তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই সৌরাংশুর ঘরে ললিতা আবার নেমে এলো। এবারো ভয়ে-ভয়ে, প্রতি পায়ে থেমে-থেমে। এখনো এই দিনের আলো সেই অন্ধকারের মতই আতঙ্কিত। দেয়ালে-দেয়ালে এখনো সেই কল্পনার অশরীরী ছায়া দুলছে। সমস্ত শূন্যে তেমনি নির্জনতা রয়েছে ঘন হয়ে।

শুধু তার বেশ-বাসেই নেই সেই ছটা, মুক্তির সেই বিস্ফারণ। সে যেন তার অস্তিত্ব থেকে নিশ্চিহ্ন গেছে মুছে, তার পরনের শাড়িটা যেন স্তব্ধ একটা কবরের আস্তরণ। সে যেন বহন করছে না তার শরীর, তার শরীরই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, যেমন বাঘের মুখে তার অসহায় শিকার।

মহীপতি রোগা, অস্ফুট গলায় জিগগেস করলে : কে ?

কাল যে জায়গায় এসে সে দাঁড়িয়েছিলো, অলক্ষ্যে সেইখানটিতেই ললিতা সরে এলো।

—ও! তুমি ? মহীপতি চাঞ্চল্যের মৃদু চেষ্টা করলে, কিন্তু শরীর তাকে উঠে বসতে দিলো না। স্বপ্নের কোন দূরত্ব থেকে তরল, প্রায় প্রসন্ন গলায় বললে—এতোক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমি এই সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে ছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আসবে। আমি জানতাম তুমি না এসে থাকতে পারবে না।

এত সহজে ললিতা তার ফণা গুটোতে পারলো না; বললে, জ্বলে উঠে বললে,—কিন্তু আমি জানতাম না তুমি আবার এখানে আসতে পারো।

—আমিও জানতাম না। মহীপতি বিশীর্ণ একটু হাসলো : কিন্তু প্রচণ্ড প্রকৃতির পরিহাস। এই নিষ্ঠুর বহিঃপ্রকৃতির। সন্নেসি হলে কী হবে, তাকে জয় করতে পারলাম না। আমাকে ধরলো এসে এই কালরোগ, সেইদিন আমার প্রথম মনে পড়লো, সন্নেসিরো শরীর আছে। আর শরীর যখন আছেই, তখন কী হবে তাকে অতিক্রম করার দুঃসাধ্য পরিশ্রম করে ? এক নিমেষে আমার সমস্ত গর্ব শেষ

হয়ে গেলো, আমি হেরে গেলাম। শরীরের সঙ্গে পেরে উঠলাম না। পারলাম না তাকে ছাড়িয়ে যেতে। চোখের সামনে দেখছি আমার সেই পরাজয়ের বিভীষিকা। মহীপতি ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এলো, বললে,—আর শরীর যে আমাদের কী অমূল্য সম্পদ এই কথাটা কতো পরে বুঝতে পারলাম।

ললিতা তার দিকে শূন্যায়মান চোখে চেয়ে রইলো। বিশ্বাস করা যায় না এমন পরাভব, চেনা যায় না এমন দারিদ্র। কোথায় সেই বলিষ্ঠ কান্তি, কোথায় বা সেই তার মহীয়ান দৃপ্ততা। জীর্ণ একটা কঙ্কালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। কোথাও এতটুকু স্পর্শের নিমন্ত্রণ নেই—রাশীভূত আবর্জনা। তার নিশ্বাস লেগে ঘরের সমস্ত হাওয়া যেন পঙ্কিল, অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। তার এই শারীরিক উপস্থিতিটা যেন মূর্তিমান একটা পাপ। তার অস্বাস্থ্য যেন কলুষিত একটা চরিত্রহীনতা। ঘৃণায় ললিতা আশরীর দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো।

—আমি সেই নির্জনতায় বসে কিছুতেই মরতে পারলাম না, মহীপতির দুই নিষ্প্রভ চোখ বেদনার দীপ্তিতে হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠলো : যখন শত সন্ন্যাসেও নশ্বর শরীরকে কিছুতেই বশীভূত করা গেলো না ললিতা, তখন আমার সমস্ত কথা মনে পড়ে গেলো—বাঙলা-দেশের কথা, বাড়ি-ঘরের কথা, তোমার কথা।

ললিতা দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল,—দয়া করে আমার কথা আর মনে করতে গেলে কেন ?

মহীপতি যেন স্বপ্নে কথা কইতে লাগলো : যদি বিশ্বাস করো ললিতা, তো বলি সবাইর আগে তোমার কথাই মনে পড়লো, যেমন গভীর দুঃখের সময়ে ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। তুমি জানো না তোমাকে দেখবার জন্যেই আমি এই অসুস্থ দেহে প্রথম বাড়িতেই গিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু শুনলাম তুমি সেখানে নেই। চোখ দিয়ে ললিতার নাগাল পাবার জন্যে মহীপতি কাৎ হতে চেষ্টা করলো, কিন্তু

শরীরে নেই এতোটুকু প্রশ্রয়। বললে,—বাবা-মা সেবা-চিকিৎসার তুমুল একটা আয়োজন করলেন, কিন্তু মন না ভরলে শরীর সারবে কী করে? মা-কে তোমার কথা জিগগেস করলাম, শুনলাম—তোমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নাকি উঠে গেছে, তোমার নাম উচ্চারণ করাও নাকি ভীষণ কলঙ্কের কথা।

ললিতা জ্বলে উঠলো : কেন, তা জিগগেস করেছিলে?

—করেছিলাম। প্রশান্ত গলায় মহীপতি বললে,—কিন্তু তাতে তোমার ওপর আমার ভক্তি আরো বেড়ে গেলো, ললিতা। শুনলাম, তুমি আমাকে কায়মনোবাক্যে অস্বীকার করেছ, যা-কিছু তোমার জীবনে মৃত, অপসৃত, তার প্রেতমূর্তির তুমি পূজা করতে চাও নি! খবরটা শুনে আমি অন্তত আহত হইনি, ললিতা, বরং,—মহীপতির গলা মমতায় কোমল হয়ে এলো : বরং তোমার প্রাণের উত্তপ্ত পরিচয় পেয়ে তোমাকে যেন আমি আরো গভীর ভালোবেসে ফেললাম।

পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ একটা মূর্তির মত অটুট রেখায় ললিতা দাঁড়িয়ে রইলো।

—আমি ভেবে পাচ্ছি না ললিতা, আমার শরীরের এই অবস্থায় কী করে আমি এতো কথা অনর্গল বলে যাচ্ছি। মহীপতি চোখ দিয়ে ললিতাকে আবার ছুঁতে গেলো; বললে,—তোমাকে পাবো না, এই সত্যটি যেন আমাকে তখন থেকে ক্ষণে-ক্ষণে আলোড়িত করতে লাগলো, তোমাকে আমি চাই। মা-কে বললাম, তোমাকে কোনরকমে নিয়ে আসা যায় কিনা। কিন্তু যে আমাকে অপমান করেছে, বাবা-মা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তার নিশ্বাস পর্যন্ত তাঁরা সইতে পাররেন না, আমারই বা কেন এই অশোভন পক্ষপাত? আমি তাঁদের কোনো কথা শুনলাম না, ঝগড়া করলাম, লোকজন জোগাড় করে পালিয়ে এলাম কলকাতা। তখনো আমার গায়ে যেন কিছুটা সামর্থ ছিলো, কিন্তু এখন একেবারে ভেঙে গেছি।

—সত্যি, তোমারই বা কেন অশোভন পক্ষপাত? ললিতা মলিন, ম্রিয়মাণ গলায় বললে,—যখন তোমাকে আমি অপমান করেছি জানলে, যখন সমস্ত সম্পর্ক তুলে নিয়েছি একেবারে, তখন কেনই বা তুমি এইখানে আসতে গেলে? তোমার শরীরের কী বিপজ্জনক অবস্থা তা তুমি জানো না?

—তুমি আমাকে অপমান করেছ? মহীপতি মুগ্ধের মতো তার দিকে চেয়ে রইলো: তুমি যে আমাকে সত্যি অপমান করতে পারলে, সেইখানেই তো আমি মূল্যবান হয়ে উঠলাম, তখনই তো আমাব বাঁচতে আবার ইচ্ছে হলো। আমাকে যে অপমান করতে পারলে, সেইখানেই তো তোমার মহিমা, ললিতা। সেইখানেই তো তুমি সুন্দর। সেইখানেই তো তুমি পবিত্র।

—কিন্তু আমার কাছে তুমি তবে এখন কী আশা করতে পারো? ললিতা নয়, ঘরের দেয়াল যেন কথা কইলে।

—আমি কিছুই আশা করি না। আশা করবার আমার স্পর্দ্ধাও নেই কোনো। শুধু তোমাকে আমি একটিবার দেখতে এসেছি। মহীপতি শিশুর মতো সরল কাতরতায় বললে,—একটিবার আমার কাছে এসে বসবে, ললিতা?

ললিতা আপাদমস্তক পাথর হয়ে গেলো, যেন কে তাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝের উপর ছুঁড়ে মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে। তার আর যেন একবিন্দু চঞ্চলতা নেই, যেন সে পুঞ্জীভূত একটা ভার হয়ে উঠেছে। সেই ভার যেন সে সহসা মহীপতিকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলে। কোনোদিকে তাকিয়ে দেখলো না, চারদিকের অন্ধকার, অবরুদ্ধ দেয়ালের একটা দুর্বল অংশে মাথা কুটে সে একটা বাতায়ন সৃষ্টি করতে গেলো। কে জানে হয়তো সেই ছিদ্রপথ দিয়ে সমস্ত আকাশ তার চোখের সামনে উন্মুক্ততায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ললিতা গাম্ভীর্যে নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ালো, রুদ্ধ কঠোর গলায় বললে,—না। আমি অশুচি, আমি কলঙ্কিত।

—তুমি কলঙ্কিত ?

—হ্যাঁ, আমি একজনকে ভালোবাসি।

—তুমি একজনকে ভালোবাসো, সেইজন্যে তুমি কলঙ্কিত ? রোগা, বিবর্ণ মুখে মহীপতি অদ্ভুত হেসে উঠলো : কে বললে ! আমারো চেয়ে কলঙ্কিত তুমি ? আমারো চেয়ে অশুচি ? আমার এই রোগ, এই জরা, এই পরাজয়—এর চেয়ে কলঙ্ক, এর চেয়ে পাপ আর কিছু থাকতে পারে পৃথিবীতে ? তুমি ভালোবাসো, তুমি ভালোবাসতে পেরেছ, এই তো তোমার গৌরব, ললিতা। মহীপতি দুই চোখে আকুল হয়ে উঠলো : তবু, হোক, তুমি একটিবার আমার কাছে এসে বসবে ? আমার প্রতি তোমার এই ঘৃণা, অন্যের প্রতি তোমার সেই ভালোবাসা, তোমার ব্যক্তিত্বের এই পবিত্রতাকে একটিবার আমাকে স্পর্শ করতে দেবে, ললিতা ?

ললিতা যেন এক নিমেষে শূন্য হয়ে গেলো, নিরস্ত্র, নিঃসহায়। পায়ের নিচে দাঁড়াবার তার আর নেই মাটি, উর্দ্ধে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরবার তার আর নেই কোনো আকাশ। শুধু সামনে শূন্য একটা তক্তপোষের উপর মহীপতি আছে শুয়ে।

মহীপতি আবার বললে—তুমি যে আমাকে অস্বীকার করতে পারলে, আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারলে, সেইখানেই তো তুমি দীপ্ত, অকলঙ্ক। আমার জন্যে যে তুমি প্রতীক্ষা করে থাকো নি নিশ্চল পঙ্গুতায় তুমি যে প্রসারিত হয়ে পড়েছ চেতনা থেকে চেতনায় আবিষ্কার করেছ নিজেকে নিজের রহস্যে—সেইখানেই তো তুমি বাঁচলে, সেইখানেই তো তুমি একান্ত করে সত্য হয়ে উঠেছ। তাই দেখতেই তো আমি এই অসুখ নিয়েও এখানে ছুটে এসেছি। আমিও তাই আর এ-মুহূর্তে ব্যর্থ নই ললিতা।

ললিতা স্বপ্নাবিষ্টের মতো ধীরে-ধীরে এক পা এগিয়ে এলো। বললে—কী বলছে নিজেই তার সে কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না : আমার মনের এই পরিবর্ত্তন কি তুমি মেনে নিতে পারবে না ?

—প্রচুর মেনে নিতে পারছি, মনে-প্রাণে করছি আমি এর প্রচুরতরো সম্মান। মহীপতি বিছানার উপর আস্তে তার একখানি হাত প্রসারিত করে দিলো : জীবনের বিচিত্রতরো সম্ভবনীয়তাকে আমার চেয়ে এ-মুহূর্তে কেউ আর বেশি শ্রদ্ধা করতে পারছে না, ললিতা। আমার শরীরে, সেই আমার সবল প্রফুল্ল শরীরে, এই পরিবর্তন হতে পারে, আমি তা কখনো ভাবতে পারতাম—আর তার কাছে মন, তোমার মন—মানুষের মন। মহীপতি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেললো ঃ আমার এই শরীরের কুৎসিত পরিবর্তনের চেয়ে তোমার মনের সেই রূপান্তর কতো সুস্থ, কতো সুন্দর, কতো ঐশ্বর্যময়। ও কী ললিতা, তোমার চোখে জল কেন? মহীপতি অস্থির হয়ে উঠলো ঃ না, না, তোমার কিছু ভয় নেই, আমি তোমার জীবনের বাধা হবো না। বরং সংসারে তোমার সেই সত্যকে আমি প্রতিষ্ঠিত করবার সাহায্য করবো। কিছু তোমার ভাবনা নেই, আমার মতো শত-লক্ষ এই হেরে যাওয়ার চাইতে তোমার মতো একটি সার্থকতায় ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি ধন্য হয়ে ওঠে। আমি তোমার কেউ নই, কিছু নই, আমাকে তুমি ভয় কোরো না, আমি চিরকাল সত্যের পূজা করে এসেছি, তোমার এই সত্যকেও আমি শ্রদ্ধা করবো,ললিতা।

ললিতা কোনো কথা বললো না, ধীরে-ধীরে তার বিছানার পাশটিতে এসে বসলো। তার নির্বাপিত দুই চক্ষু থেকে অশ্রুর দীর্ঘ দুটি ধারা নেমে এসেছে।

—না, না, কিছুই তোমার ভয় বা দুঃখ করবার নেই। আমি সেদিনো যেমন মুছে গিয়েছিলাম, আজও তেমনি মুছে যাবো। শুধু তারই আগে দেখতে চেয়েছিলাম তোমার এই সত্যের উদ্ঘাটন। কিছুই তোমার কাছে আমার আর আশা নেই, ললিতা, শুধু তুমি তোমার সত্যে উদ্ধত হয়ে ওঠো। তোমার সেই জ্যোতির্ময়তা দেখবার জন্যেই হয়তো আমি এসেছি, আমি একটু সুস্থ বোধ করলে কালকেই আবার চলে যাবো না-হয়।

ললিতা সন্তর্পণে মহীপতির কপালের উপর একখানি হাত রাখলো। বেদনায় কোমল, সেবায় বিনম্র একখানি হাত।

মহীপতি ক্লান্ত, আচ্ছন্ন গলায় বললে,—পৃথিবীর সমস্ত প্রাণে যে নিয়ম অব্যাহত হয়ে বিরাজ করছে, মানুষে আর গাছে, পশুতে আর পতঙ্গে—সেই প্রেম, তোমার প্রেমকে আমি ককৃখনো অশ্রদ্ধা করতে পারবো না। ইন্দ্রিয়ের রশ্মিজালে সেই অতীন্দ্রিয়ের আরতি। সেই প্রাণনায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া, সেই বিস্ময়, সেই অপরিপূর্ণতা। আমিও হয়তো একদিন তারই সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। আমি না হয় ফিরে এসেছি, কিন্তু তুমি থামবে কেন, তুমি কেন চোখের জল ফেলছ?

মহীপতির কপালে ধীরে-ধীরে হাত বুলুতে-বুলুতে ললিতা বললে, —তুমি বেশি কথা বোলো না, ডাক্তার তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে গেছেন।

—কিন্তু তুমি আর কাঁদবে না বলো? মহীপতি সেই একখানি হাত তার কপালের উপর চেপে ধরলো।

—না, আমি কাঁদবো কেন? ললিতা শুকনো, শূন্য চোখে চেয়ে বললে,—আমার আর কী দুঃখ।

———